মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী

সাইফুদ্দীন চৌধুরী

জীবনী গ্রন্থমালা

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন : ১৯৯২

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী

১৯০০—১৯৬০

সাইফুদ্দীন চৌধুরী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

বা/এ ২৫৭৪

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

বর্ণলিপি
উৎপল দাস

মূল্য
বিশ টাকা মাত্র
দুই মার্কিন ডলার

JIBANI GRANTHAMALA : A series of literary biographies

MOHAMMAD ABDULLAHEL KAFI by Saifuddin Chowdhury. Published by Bangla Academy Dhaka, Bangladesh. First edition : Magh 1398 / February 1992. Price : Taka 20.00 only US dollar 2.00 only

Tribute to the Martyrs of the Language Movement 1952

ISBN 984-07-2583-1

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমীর জীবনীগ্রন্থ প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাস-রচয়িতাগণ যে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও উপকৃত হয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, গবেষণা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্যে যেসব প্রামাণ্য উপাদান আবশ্যক, বাংলা একাডেমীর জীবনী গ্রন্থমালা-প্রকল্প সেই অভাব পূরণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বাস্তবায়ন হয়। ফলে, একাডেমীর এই বিশেষ প্রকল্পটি বাংলার বিদ্বৎ সমাজ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিতও হয়। এই প্রকল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের যথাবিহিত পারম্পর্য রক্ষা করে ২০ জন বরণীয় সাহিত্য-সেবীর জীবনালেখ্য পাঠককে উপহার দিচ্ছি। এবারের এই ২০টি গ্রন্থসহ এ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী সর্বমোট ১৪৭ জন সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবনী প্রকাশ করলো। ভবিষ্যতেও একাডেমী এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজটি অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করবে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারীতে ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন প্রথিতযশা সেই ২০ জন সাহিত্যিকের জীবনালেখ্য।

সর্ব-সংস্কারমুক্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক আবদুল্লাহেল কাফী ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অনমনীয় পৌরুষের অধিকারী। স্বাধীন চিন্তার জোরালো অভিব্যক্তি ঘটেছিলো তাঁর সংস্কৃতি-মনস্ক চিন্তা-চেতনায়। অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করতো। পরবর্তী জীবনে তাঁর সাংগঠনিক জীবনের সঙ্গে তিনি সাংবাদিকতার পেশাকে যুক্ত করেন। 'সত্যাগ্রহ' পত্রিকা তাঁর সাংবাদিক জীবনের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ডক্টর সাইফুদ্দীন চৌধুরীর এ গ্রন্থ একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর জীবনকথার সার্থক রূপায়ণ।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সূচী

জীবনকথা	৯
শিক্ষাজীবন	১৩
সাংবাদিক জীবন	১৯
সাহিত্য-সাধনা	২৯
রচনার নিদর্শন	৩৪
রচনাপঞ্জি	৯১
শেষজীবন ও মৃত্যু	১০৪
জীবনদর্শন ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য	১০৫
সমকালীন প্রতিক্রিয়া	১০৯
তথ্যনির্দেশ	১১২

জীবন-কথা

জন্ম ও বংশ পরিচয়

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে ক'জন মুসলিম জ্ঞান-তাপস ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে কর্মজ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সহজাত বুদ্ধির, নবীনের সঙ্গে প্রাচীনের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন--ক্ষুরধার লেখক, নির্ভীক সাংবাদিক, অসাধারণ বাগ্মী, দক্ষ রাজনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলামী আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাসী এই ক্ষণজন্মা মনীষী ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাঁর সমুদয় কর্মের দ্বারা বাঙালী মুসলমান সমাজকে স্থবিরতার মধ্যে থেকে তুলে এনে প্রাণের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহেল কাফীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার টুব গ্রামের মাতুলালয়ে ১৯০০ সালে। এই বৎসর ঠিক কোন্ মাসে এবং কোন্ তারিখে জন্মেছিলেন—তা সঠিক জানা যায় নি। তাঁর পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে।

আব্দুল্লাহেল কাফীর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল হাদী এবং পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে সৈয়দ রাহাত আলী এবং সৈয়দ বাকের আলী। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের তুস নগরীর অধিবাসী। সৈয়দ আদম নামক একব্যক্তি পারস্য থেকে হায়দরাবাদে নিবাস স্থাপন ক'রে মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০২ সালে ইসলাম খান বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হলে তাঁর অন্যতম সেনাপতি হিসেবে চট্টগ্রামে আসেন এবং মগ দস্যুদের দমনের কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই চট্টগ্রামের সুলতানপুরে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি কাটান। 'বড় আদমলশকর' নামে প্রসিদ্ধ সৈয়দ আদমের মাযার এখনও সেখানে

আছে। সৈয়দ আদমের তিনপুত্র—সৈয়দ নসরত আলী, সৈয়দ ফরহাদ আলী এবং মুহম্মদ রিজা আলী। নসরত আলী, ১১ বৎসর বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন এবং ফরহাদ আলী পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আরাকানে পলায়ন করেন। তৃতীয় পুত্র সৈয়দ রিজা আলী ইসলাম খানের কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য যে, ইসলাম খানের কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে সম্পর্কিত হবার পর কিছুকাল 'খান' উপাধি নিজ নামের পাশে উপাধি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সৈয়দ রিজা খানের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম ছিলেন সৈয়দ রাহাত আলী। এই সৈয়দ রাহাত আলীই আব্দুল্লাহেল কাফীর পিতামহ এবং সৈয়দ আব্দুল হাদীর পিতা।

সৈয়দ আবদুল হাদী নিজগৃহে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর চট্টগ্রাম শহরের মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ছকে বাঁধা ইসলামী শিক্ষা এবং আলাওলী বাংলায় তাঁর মন না ভরায়, উচ্চশিক্ষার্থে দিল্লী যান হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য। দিল্লীতে তিনি আহলে হাদীস মযহবের বিখ্যাত কামেল, বিশিষ্ট আলেম ও স্বনামখ্যাত ওস্তাদ সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্লভীর মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করে দৈহিক এবং মানসিকভাবে একজন বিপ্লবী হয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন।

কিন্তু সৈয়দ আবদুল হাদীকে আহলে হাদীস আন্দোলনের একজন বিপ্লবী সৈনিক হিসেবে হানাফী মাযহাবপন্থী পরিবার গ্রহণ করতে রাজী হন নি। জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পিতা তাঁকে পরিবারে ঠাঁই না দিয়ে ত্যাজ্যপুত্র করে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেন। বাড়ীতে স্থান না হওয়ায় সৈয়দ আবদুল হাদী সুলতানপুর ছেড়ে একেবারে চলে যান পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে। হুগলী গিয়ে তিনি মুহসিনিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক এবং বহুগ্রন্থ প্রণেতা জ্ঞাতি চাচা মওলানা আবদুল কাদিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হানাফী মাযহাবের এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ সৈয়দ আবদুল হাদীকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজের বিদুষী কন্যাকে তাঁর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। শ্বশুরের প্রচেষ্টায়ই আবদুল হাদী প্রথমে হুগলী স্কুলে এবং পরে হুগলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে আবদুল কাদির যখন অবগত হন তাঁর জামাতা আহলে হাদীস মাযহাবের অনুসারী তখন ভীষণ ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু কন্যা

এবং জামাতার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভাব দেখে অবশেষে আবদুল কাদির তাঁর ক্রোধ অবদমিত করেন। সামান্য কিছুদিন দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরই আবদুল কাদিরের দুহিতা পরলোকগমন করেন। কন্যা বিয়োগের পর কিন্তু জামাতার সঙ্গে আব্দুল কাদিরের মতবিরোধ একেবারে তুঙ্গে উঠে। এর পরিণাম হিসেবে সৈয়দ আবদুল হাদী মাদ্রাসার চাকুরী হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে বেকার হয়ে পড়েন।

হুগলী মাদ্রাসার চাকুরী হারিয়ে, চাকুরী অন্বেষায় নানা জায়গায় ছুটেন। এইরূপ বেকার অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতেই তিনি এক সময় এসে পোঁছান বর্ধমানের রসুলপুর পরগণার 'টুব' গ্রামে। সেখানে বসবাসের অল্পকাল পরই তিনি স্থানীয় শাহ্ খুররম হুসায়নের বংশধর গদ্দীনশীন পীর শাহ্ দিরাসাতুল্লাহর পৌত্রী উম্মে সালমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই উম্মে সালমার গর্ভেই সৈয়দ আবদুল হাদীর পাঁচ সন্তান আবদুল্লাহেল বাকী, আবদুল্লাহেল কাফী, সফিয়া, ফাতিমা, হাবীবার জন্ম হয়। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহলো সৈয়দ আবদুল হাদীর এই শ্বশুর মওলানা রহীমুল্লাহ ছিলেন একজন উচ্চমানের বুজর্গ ব্যক্তি।

দ্বিতীয় বিবাহের কয়েক বৎসর পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে রংপুরের লালবাড়ী পরগণার বখ্শীগঞ্জে এসে আহলে হাদীসপন্থী লোকদের নিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে তার পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। একেবারে মাদ্রাসার নিকটেই নিজ আবাস নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। সৈয়দ আবদুল হাদী এবং তাঁর স্ত্রী এলাকার লোকজনের কাছে এতই জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন যে, সবাই তাঁদের দু'জনকে 'আব্বাজী' এবং 'আম্মাজী' বলে সম্বোধন করত। এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ আবদুল হাদীর বেশিদিন বখশীগঞ্জে থাকা সম্ভব হয় নি। সেখান থেকে চলে গিয়ে দিনাজপুর জেলার 'বস্তির আড়া' নামক এক জনহীন জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় নতুন ভাবে বসবাস শুরু করেন।

সৈয়দ আবদুল হাদীর বখ্শীগঞ্জ ছাড়ার কারণ ছিল, লালবাড়ীর জমিদারের সঙ্গে মত-পার্থক্য। ধর্মীয় মত-পার্থক্য প্রচণ্ডরূপ ধারণ করলে, ভক্ত এবং অনুরক্তরা পাঁচ/ছ' মাইল দূরে উপর্যুক্ত জনবসতিশূন্য

এলাকায় তাঁকে নিয়ে আসেন। 'বস্তির আড্ডা'তেই তিনি জীবনের বাকী দিনগুলি কাটান। মরহুমের মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নতুন নামকরণ করা হয় 'নূরুল হুদা'।

সৈয়দ আবদুল হাদীর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লাহেল বাকী ছিলেন কনিষ্ঠ আবদুল্লাহেল কাফী অপেক্ষা ১২ বৎসরের বড়। আবদুল্লাহেল বাকী ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক এবং রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ছিলেন এদেশের জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং অবিভক্ত বাংলার কৃষক-প্রজাপার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৩২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে কারাবরণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে নির্বাচিত হন ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। পরবর্তীকালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যপদ সহ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।*

আবদুল্লাহেল কাফী শৈশবে কিছুটা দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন বলে জানা যায়।

> শৈশবে তিনি কিছুটা চঞ্চল প্রকৃতির পরিচয় দেন। পাখীর বাসা খোঁজা আর বাচ্চা ধরে দেওয়ার জন্য বয়স্কদের নিকট আবদার করতেন বলে শোনা যায়। বাড়ীর কাছের ছোট নদীতে তিনি গোসল করতে ভালবাসতেন।[১]

---

* 'বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে কামরুদ্দীন আহমদ আবদুল্লাহেল বাকীর সমসাময়িক কালের রাজনীতির ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। এই শতকের চল্লিশের দশকে বাকী সাহেবের রাজনৈতিক সুহৃদদের অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন আশ্রফউদ্দীন চৌধুরী, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী, আবুল মনসুর আহমদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

শিক্ষাজীবন

আবদুল্লাহেল কাফী ছেলেবেলায় পিতৃগৃহেই পিতা-মাতার কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। মায়ের নিকট থেকে শিখেছিলেন উর্দু ও ফারসী ভাষা এবং পিতার নিকট পাঠ গ্রহণ করেন ফারসী সাহিত্যের। পিতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে আবদুল্লাহেল কাফী লিখেছেন ঃ

> আমি তাঁর কাছ থেকে গোলিস্তান, বুলুগোল মারামের কিঞ্চিৎ তরজমা অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম।[২]

তাঁর বয়স যখন মাত্র ৬ বছর, তখন পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহেল কাফী পিতা প্রতিষ্ঠিত নূরুল হুদা মাদ্রাসায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, ভগ্নিপতি মওলানা আবদুল মান্নান, বিহারের 'আরা'র মওলানা আবদুল্লাহ খান, খুলনার সুফী আবদুর রহমান প্রমুখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ঐ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। শোনা যায়, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালক আবদুল্লাহেল কাফীর একবার মাত্র কোন কিছু শুনলেই তা মুখস্থ হয়ে যেত।

নূরুল হুদা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন শেষে রংপুর শহরে এসে কৈলাসরঞ্জন হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে বছর তিনেক পড়ালেখার পর চলে যান পশ্চিম বঙ্গের হুগলীতে। সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে চলে আসেন কলকাতা শহরে। কলকাতার বিখ্যাত মাদ্রাসা আলিয়ার এ্যাংলো-পারশিয়ান বিভাগে অধ্যয়ন শুরু করেন। এই মাদ্রাসা থেকেই তিনি ১৯১৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পাশের পর ভর্তি হন শহরের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। দুই বৎসরে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কলেজেই বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। বি.এ. ভর্তি হলেও স্নাতক ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব হয় নি। বৃটিশবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ তখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করতে আবদুল্লাহেল কাফীও সেই আন্দোলনে যোগ দেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এভাবেই তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তবে তিনি কিন্তু সারাজীবনই ছিলেন একজন জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বি.এ. ক্লাশের ছাত্র হয়েও হয়ে গেলেন পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্মী। বলতে কী কলেজের খেলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদের প্রধান নেতা। নব্যশিক্ষিতদের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ প্রবৃত্তি এবং আরবী শিক্ষিত সমাজে কূপমণ্ডুকতা এবং অসহিষ্ণু মনোভাবই মূলতঃ তাঁকে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন :

> এদেশের মুসলমানদের প্রতি বৃটিশের শোষণ এবং নির্যাতন ও তথাকথিত পীরবাদ অনাচার এক সময়ে আমাকে জাতির স্বার্থে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল।[৩]

তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপর লক্ষ্য ছিল, দ্বিধাবিভক্ত মুসলমান সমাজকে যে অন্তর্ঘাতমূলক দলীয় কোন্দল সংকীর্ণ করে রেখেছে, যার ফলে মুসলিম জাতীয়তার অখণ্ডত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে— তা থেকে তাদের উদ্ধার করা।

নানা রাজনৈতিক দর্শনে প্রজ্ঞাবান যুবক ছাত্রনেতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেললেন 'আল হেলাল' ও 'আল বালাখ' পত্রিকার সম্পাদক প্রথিতযশা আলেম ও খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ মওলানা আবুল কালাম আযাদের। মওলানা আযাদ এই সম্ভাবনাময় ইসলামী চিন্তাবিদ ও তরুণ রাজনৈতিক কর্মীকে প্রিয় শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহেল কাফী, মওলানা আযাদের সাহচর্যে এসে তাঁর অন্তর্নিহিত ভাব বিকাশ করার পথের সন্ধান লাভ করেন। আবদুল্লাহেল কাফী মওলানা আযাদের আদর্শে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, তাঁকে এক সময় বলাই হতো বাংলার আবুল কালাম আযাদ। উর্দু সাপ্তাহিক 'আল এতেছামে' লেখা হয়েছিল এ প্রসঙ্গে :

> প্রকৃত প্রস্তাবে মওলানা আবুল কালাম আযাদের দীর্ঘ সাহচর্যের সৌরকর স্পর্শে মওলানা কাফীর অন্তর্নিহিত প্রতিভা চমকিত ও রওশন দীপ্ত হয়ে উঠে। দীর্ঘদিন তাঁর সাহচর্যে কাটিয়ে মওলানা আযাদের এতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন যে, বোধ হয় আর কারো ভাগ্যে তা ঘটেনি। মওলানা আযাদ মওলানা কাফীকে

তাঁর প্রিয় সাগরেদ রূপে মনে করতেন। মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী মওলানা আযাদের সম্পাদিত 'আল হেলাল' এবং 'আল বালাখে' যেন মনে প্রাণে ডুব দিয়েছিলেন। তিনি মওলানা আবুল কালামের রঙে এভাবে রঞ্জিত হয়েছিলেন যে, তাঁকে বাংলার আবুল কালাম আযাদ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হত।[৪]

বস্তুতপক্ষে ব্যাপারটাও ছিল তাই। মওলানা আযাদের মত তিনিও ছিলেন স্বাধীনতাকামী অনমনীয় দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল প্রতীক। মওলানা আযাদের ন্যায় তিনিও ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং দক্ষ পত্রিকা সম্পাদক। মওলানা সাহেবের কোরআনের তফসীর ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হয়ে তিনি আল-কোরআনের বিশদ ব্যাখ্যা আয়ত্ত করেন। মওলানা আযাদের নির্দেশেই তিনি ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গীয় খেলাফত পার্টির পক্ষ হতে কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। ঢাকায় তিনি কিছুদিন খাজা আব্দুল করিমের বাসায় অবস্থান করে দলীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছুকাল আব্দুল্লাহেল কাফী ঢাকা ছাড়া কুমিল্লা, গাইবান্ধা এবং অন্যান্য কিছু এলাকায় খেলাফত ও কংগ্রেসের আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। শোনা যায়, 'ভারত রক্ষা আইনে' গ্রেফতার হয়ে রাচীতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায়ও মওলানা আযাদ আব্দুল্লাহেল কাফীকে পত্র মারফত তাঁর কর্মপদ্ধতির বিষয়ে অবহিত করতেন।

আবদুল্লাহেল কাফীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে, 'বঙ্গীয় জমঈয়েতুল ওলামা' তাঁকে সহযোগী সম্পাদক মনোনীত করে। পরে তিনি ঐ সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হন। অপরদিকে খেলাফত পার্টি এবং কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও তিনি শহীদ সুহ্রাওয়ার্দীর ইণ্ডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টি, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এবং মওলানা আযাদের নতুন রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনালিষ্ট পার্টিতে সক্রিয় কর্মীর ভূমিকায় অংশ নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। এই সময় নেতাজী সুভাস বোসের সঙ্গেও একত্রে কিছুদিন কাজ করেছেন বলে জানা যায়। শুধু একত্রে কাজই নয়, শোনা যায়, নেতাজীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্যও বজায় ছিল।[৫]

উল্লিখিত রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে তিনি বগুড়া এবং ময়মনসিংহ জেলার নানা জনসভায় বক্তৃতা করেন।

আব্দুল্লাহেল কাফীর এই সময়ের বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করে মতিয়ুর রহমান খাঁ লিখেছেন ঃ

> বাংলা ১৩২৮ সাল। বগুড়ার গাবতলী রেলস্টেশনের নিকট এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হইয়াছে বঙ্গ বিখ্যাত বাগ্মী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রধান বক্তারূপে যোগদান করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি আসিতে পারেন নাই। লোকের মনে নৈরাশ্যের কালো ছায়া নামিয়া আসিল। শ্রোতাদের উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হইয়া গেল।
>
> সভামঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন ২০/২১ বৎসরের এক সুদর্শন বালক। সুমধুর কণ্ঠে তিনি কোরআন তেলাওত করিলেন, অপূর্ব ভঙ্গিতে বক্তৃতা শুরু করিয়া দিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ সেই অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন।[৭]

১৯২৭ সালে তিনি আঞ্জুমানে আহলে হাদীসের সঙ্গে যুক্ত হন। বহুদিন পর্যন্ত ঐ ধর্মীয় সংগঠনের—বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার ও সংগঠনে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ আলীয়া মাদ্রাসা, জামালপুর জেলায় বালিজুড়ী ও সিঙ্গুয়া সহ অনেক জায়গায়, মাদ্রাসা ও বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে 'মুসলিম ন্যাশনালিস্ট পার্টি'র অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি শাহ আতাউল্লাহ বোখারী, মৌলভী শামসুদ্দীন প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। দিনাজপুর জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন। আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে তাঁকেও আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আলিপুর কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেই যোগ দেন বন্যার্তদের সেবার কাজে। আবার আসে রাজনীতির ডাক। ১৯৩২ সালে শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্-

দীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ঝাটিকা সফরে আসেন। বলা বাহুল্য, ঐ সফরকালে দিনাজপুরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অপরাধে পুনরায় গ্রেফতার হন। ৬ মাস কারাবাসের রায় দিয়ে বৃটিশ সরকার এবার তাঁকে নিয়ে যায় দমদম জেলে। জেল থেকে বেরিয়েই শুরু করেন রাজনৈতিক তৎপরতা—বিশেষ করে জনমত তৈরী করতে। ১৯৩৫ সালে তিনি শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি'র' নেতা হিসেবে রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করেন। ১৯৪০ সালে যোগ দেন অন্যতম নেতা হিসেবে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনে'। ঐ সম্মেলনে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করে তিনি সকলের প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন। মুনতসির আহমদ রহমানী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> সন ইংরেজী ১৯৪০ সাল। দিল্লীতে অতি শান-শওকতে অল-ইণ্ডিয়া আযাদ মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বঙ্গাসামের প্রতিনিধিরূপে যারা যোগদান করেছিলেন মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।. . .যাঁর অনলবর্ষী ও তেজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী সচকিত হয়ে গেল, সব দিক থেকেই ধন্য ধন্য রব উঠে গেল, সভা সরগরম হয়ে উঠল।[৮]

১৯৪২ সালে তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালনোপলক্ষে সউদী আরব যান। মক্কার পবিত্র 'হারাম'-এ তিনি নিয়মিত ওয়াজ করতেন হজ্জের প্রাক্কালে। আবদুল্লাহেল কাফীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনীষা ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে আধুনিক সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আজীজ ইবন্ সাউদ মূল্যবান পোষাকে [খিলঅত] ভূষিত করেন এবং বহু অমূল্য গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।*

---

* শোনা যায় হজ্জব্রত পালনোপলক্ষে সউদী আরব যাত্রার সময় ইংরেজ সরকার কাফী সাহেবকে 'আমীরউল হজ্জ' মনোনীত করে জাহাজের সমুদয় হজ্জযাত্রীর নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কাফী সাহেব ইংরেজ সরকারে প্রস্তাব গ্রহণ করার সাথে সাথে তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ হজ্জ যাত্রীদের মতই হজ্জযাত্রা

রাজনৈতিক নেতাদের বেশির ভাগের মধ্যেই একদেশদর্শিতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং হীন স্বার্থপরতার নজীর পর্যবেক্ষণ করে বীতশ্রদ্ধ এই প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী, হজ্ব থেকে দেশে ফিরে এসে সক্রিয় রাজনীতি থেকে একেবারে দূরে সরে আসেন। সংকল্প গ্রহণ করেন, কেবলমাত্র মুসলিম সমাজকে তিনি ইসলামী আদর্শে পুরোপুরিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে বাকী জীবন কাটিয়ে দিবেন।

তিনি ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'অল-ইণ্ডিয়া আহ্লে হাদীস কনভেনশন'-এ অবিভক্ত বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। দিল্লী কনভেনশনের পর নিখিল বঙ্গ ও আসাম অঞ্চল নিয়ে 'জমঈয়তে আহ্লে হাদীসে'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায় ২ বৎসর কাল সাধনার পর তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ১৯৪৬ সালে রংপুরের হারাগাছ নামক স্থানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কেবল মাত্র বাংলা এবং আসামই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থান থেকেও খ্যাতনামা আলেমগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেনারসের মওলানা আবুল কাশেম, পাঞ্জাবের মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল গুজরানওয়ালা প্রমুখ। এই সভায় এক প্রস্তাবে 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্লে হাদীস' গঠিত হয়। এর কেন্দ্রীয় অফিস কলকাতায় স্থাপিত হলেও ১৯৪৮ সালে তা পাবনা শহরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সালে সাংগঠনিক কাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ঢাকার নওয়াবপুর রোডে এই কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত। এই সংগঠনের প্রধান হিসেবেই তিনি ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ও পূর্বপাক নেজামে ইসলাম পার্টির আহূত সভায় সর্বদলীয় উলামা কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

করেন। হজ্ব থেকে ফেরার সময় তিনি এত বিপুল পরিমাণ গ্রন্থাদি নিয়ে এসেছিলেন যে যা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ৫টি মোষের গাড়ী আর পবিত্র 'জমজম'এর পানি নিয়ে যাবার জন্য দরকার হয়েছিল ২টি মোষের গাড়ী।

সাংবাদিক জীবন

সাংগঠনিক জীবনের পাশাপাশি আবদুল্লাহেল কাফী কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করে। ১৯২১ সালে কলকাতার ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড থেকে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রকাশ করেন বাংলা দৈনিক 'সেবক' এবং উর্দু দৈনিক 'জমানা'। মওলানা আকরম খাঁ খেলাফত পার্টির বিপ্লবীকর্মী আবদুল্লাহেল কাফীকে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত উর্দু দৈনিকের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পর মওলানা সাহেব জেলে গেলে তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন*। এ প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খাঁ নিজেই লিখেছেন :

> আমার জেলে যাওয়ার পর মওলানা কাফী সাফল্যের সহিত উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।*

আবদুল্লাহেল কাফী তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের দ্বারা খেলাফত আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। ১৯২১-এর শেষদিকে জেল থেকে মওলানা আকরম খাঁ মুক্তি পাবার পর, মওলানা সাহেবের কারাজীবনের সঙ্গী এবং 'জমানা'র অন্যতম সহকারী সম্পাদক মওলানা শায়খ আহমদ ওসমানী 'দওরে জাদিদ' এবং 'আসরে জাদিদ' নামে উর্দু পত্রিকা বের করলে 'জমানা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২২ সালে আব্দুর রশীদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় 'মোসলেম জগত' এবং ১৯২৩ সালে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত নব পর্যায়ে 'সোলতান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা দুটি মুসলিম সমাজে সাদরে গৃহীত হলেও বৃটিশ বিরোধী তেমন সোচ্চার কণ্ঠ ছিল না। আবদুল্লাহেল কাফী চাইলেন উর্দু নয়, এমন একখানি বাংলা সাপ্তাহিকী প্রকাশ করতে হবে, যার দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ১৯২৪ সালের ২৯শে

---

* ১৯৮৬ সালে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা প্রকাশিত 'মওলানা আকরম খাঁ' গ্রন্থে আবু জাফর লিখেছেন, মওলানা আকরম খাঁ কারাবরণ করার পর তাঁর জামাতা দৈনিক জমানা সম্পাদনা করে—তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল।

ডিসেম্বর (বাংলা ১৩৩১ সনের ১৪ই অগ্রাণ), কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটের ১০/৩ মুসলমান পাড়া লেন থেকে প্রকাশ করলেন সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী'। ২৯ আপার সারকুলার রোডের মোহাম্মদী প্রেস থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ফুলস্কেপ হাফ সাইজে ১২ থেকে ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে। পত্রিকাটিতে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সংবাদ ছাড়াও ছিল মুসলিম জাহান, বহিঃবিশ্ব প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ। মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে আবদুল্লাহেল কাফী এই কাজে নামেন। এঁদের মধ্যে এক-জন ছিলেন ওজিহ্উল্লাহ্ নামে চট্টগ্রামের এক তরুণ। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক, শিশু সাহিত্যিক এবং 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার আব্দুল্লাহেল কাফীর অন্যতম সহকর্মী এবং সুহৃদ খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, কাফী সাহেবের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণ করে পত্রিকান্তরে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রকাশিত ঐ রচনা থেকে জানা যায়, কাফী সাহেবের প্রকাশিতব্য পত্রিকা সম্পর্কে ধারণা তাঁর ছিল, এটি হবে আরবী ফার্সী শব্দে পরি-পূর্ণ এবং সনাতন পন্থী একটি দুর্বোধ্য পত্রিকা। কিন্তু প্রকাশের পরে দেখা গেল. 'সত্যাগ্রহী' নামেও যেমন অভিনব, তেমনি অভিনব গুণে, মানে এবং আঙ্গিকে। 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশের পর খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন আব্দুল্লাহেল কাফীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মঈনুদ্দীন সাহেবের সেই সময়ে কাফী সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল, মঈনুদ্দীন সাহেব তা তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন:

> দেখা করে বললাম ঃ মওলানা সাহেব! আপনার পত্রিকা দেখে ভারী খুশী হয়েছি। হেসে মওলানা বললেন ঃ কেন, আগে কি না-খোশ্ ছিলেন? বললাম: ভেবেছিলাম... মওলানা বললেন: বুঝেছি, ভেবেছিলেন, এটা একটা কাটমোল্লা পত্রিকা হবে! লজ্জায় মাথা নিচু করে বললাম ঃ তা-ই।[১০]

আব্দুল্লাহেল কাফী যদিও বেশ কিছু টাকা পুঁজি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু পত্রিকা পরিচালনায় অভিজ্ঞতার অভাবে এবং সৎ ও অভিজ্ঞ সহকর্মী না পাওয়ার ফলে এক বছর চলার পরেই পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। কর্মীরা তাঁর সরলতার সুযোগে পত্রিকার ক্ষতি সাধন করে সরে পড়ে। মাঝে ৭ মাস

পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়, তিনি রাজনৈতিক কাজে কলকাতার বাইরে যাবার দরুন। কলকাতা ফিরে এসে প্রেস বদল করেন। ২২ নং সুফিয়া স্ট্রিটের কান্তিক প্রেস থেকে পুনরায় 'সত্যাগ্রহী' প্রকাশিত হয়। খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন এই সময় থেকে 'সত্যাগ্রহী'তে যোগদান করেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও পত্রিকার আর্থিক দায় কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। মাত্র তিন বছর চলার পরই বাধ্য হয়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়।

মাত্র এই তিন বছর চললেও 'সত্যাগ্রহী' জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র ছিল। বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-ত্রাসণের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ছিল তার উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা। পত্রিকাটির অন্যতম আদর্শ ছিল সত্যনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্যাদি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা। এতে কংগ্রেসের বহু সত্যাগ্রহমূলক সংবাদ ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির প্রধান আকর্ষণ ছিল সম্পাদক আব্দুল্লাহেল কাফীর সম্পাদকীয় নিবন্ধ। তাঁর একটি সম্পাদকীয় (আংশিক) মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> বাংলার বাহিরে এই যে বিশাল ভারত, আর ভারতের বাহিরে এই যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড! এক একখানি মাত্র সাময়িক কাগজ যে এই হতভাগ্য বঙ্গীয় মোসলমান সমাজ ব্যতীত অন্যান্য দেশে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহা ভাবিলেও পুলকে প্রাণ শিহরিয়া উঠে!
>
> পৃথিবীর মোসলমান সমাজ এমন কি বাংলার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য মোসলমানদিগের তুলনায় আমরা ধর্মের উন্মাদনায় ও জাতীয় প্রেরণায় যে কত পশ্চাদপদ তাহা মনে হইলেও দুঃখে ও লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। কেবল গতানুগতিক জাড্য দোষ ও অন্ধ অনুকরণ স্পৃহা যে আজ বাংলার মোসলমান সমাজকে এই ভীষণ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

তাঁর সবগুলি সম্পাদকীয় নিবন্ধই ছিল বিষয়বস্তুর গৌরবে, ভাষার ওজস্বিতায় এবং বক্তব্যে আকর্ষণীয়। এ পত্রিকার আরও একটি উল্লেখ-

যোগ্য দিক ছিল, আরবী, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত রচনার অনুবাদ প্রকাশ। সেকালের মুসলিম বিশ্বের মুক্তিদূত অগ্নিবর্ষী বাগ্মী মওলানা জামালউদ্দীন আফগানীর বেশ কিছু বক্তৃতার অনুবাদ এতে ছাপা হয়েছিল। এসব অনুবাদকর্ম তিনিই বেশির ভাগ সম্পাদন করেছেন। ইসলামে জাতীয়-স্বাধীনতার স্থান, হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় জাতীয়তা, বাংলার মুসলমান, বাংগালীদের অবস্থা, বাংলার মুসলমান ও সামাজিক ব্যাধি, বর্তমান শিক্ষা ও ইসলামী সভ্যতা, মুসলিম বাংলার দাবাগ্নি, বাংলার কঙ্কাল, অধিকারের নেশাঃ ইংরেজের লোলুপতা, বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রচনা নিজে সত্যাগ্রহীর জন্য লিখেছিলেন।

'সত্যাগ্রহী' যে সমসাময়িককালে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা সুধীজনদের মন্তব্য থেকেই অবহিত হওয়া যায়। কয়েকটি মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত হলোঃ

মৌলবী মজিবুর রহমান
(সম্পাদক, 'দি মোসলমান')

> সত্যকে পাবার জন্য উন্মুখ যেমন তরুণের প্রাণ, অসত্যের মায়ায় মুগ্ধ প্রাচীনেরা কখনই তেমন নয়। 'সত্যাগ্রহী'র সম্পাদক আমার স্নেহভাজন তরুণ দেশ কর্মী! তিনি দেশ ও সমাজের সেবায় সংকীর্ণ দলাদলীর অন্ধতার উপরে স্বকীয় জ্ঞান বিশ্বাসানুমোদিত সত্যকে স্থান দিতে পারিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও পারিবেন, এরূপ বিশ্বাস আমার আছে। 'সত্যাগ্রহী'র দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে আমি প্রার্থনা করি খোদাওন্দ করিম ইহাকে সত্যের পতাকা বহন করিবার শক্তি দান করুন, মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার বর্ম বিপদে ইহাকে রক্ষা করুক।
>
> ['আরাফাত' ২রা জুলাই ১৯৬২ থেকে উদ্ধৃত]

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
(সম্পাদক 'সুলতান' ও 'আল ইসলাম')

> আল্লাহতাআল্লার অশেষ করুণা ও বিশেষ অনুগ্রহে 'সত্যাগ্রহী' স্বীয় প্রথম বর্ষ বহু বাধা বিঘ্ন ও অভাব অন্তরায়ের ভিতর দিয়া

পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল—এ সংবাদে আমি যতটা আনন্দিত হইয়াছি তেমনতর আর কেহ হইয়াছে কিনা এবং হইতে পারে কিনা সন্দেহ। কারণ বিগত ৩০ বৎসর হইতে আমি যেরূপ মোছলেম সমাজে সংবাদ পত্র প্রচারের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি তেমনতর আর কাহাকেও দেখি নাই। ---- 'সত্যাগ্রহী'র সম্পাদক ছাহেব কাগজের প্রচারোদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় মফঃস্বল ভ্রমণে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও কাগজখানি যেরূপ দক্ষতা ও গম্ভীরতা রক্ষা করিয়া সর্বোপরি মোছলমান সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণনীতি বিষয় স্বীয় দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া পরিচালিত হইয়াছে তাহা অতীব প্রশংসার কথা। 'সত্যাগ্রহী'র সর্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে সাপ্তাহিক কাগজ মাসিক আকারে প্রকাশিত হওয়ায় তাহা স্থায়ী সাহিত্যরূপে সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে। . . .

['আরাফাত', ঐ, উদ্ধৃত সংক্ষেপিত]

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিয়া)
(করটিয়ার জমিদার)

আমি 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকা পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম...। উহা যে দেশের দশের অশেষ কল্যাণপ্রদ পত্রিকা বলিয়া আদরনীয় হইবে এমত ভরসা করি - - -। এই পত্রিকার বহুল প্রচার সর্বদা বাঞ্ছনীয়। এই পত্রিকা যাহাতে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতঃ পরিচালিত হইয়া দেশের ও দশের উপকার করিতে সমর্থ হয় আমি সর্বান্তকরণে খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি।

['আরাফাত', ঐ, উদ্ধৃত]

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী
(বিশিষ্ট আলেম ও রাজনীতিবিদ)

আমার মতে 'সত্যাগ্রহী' যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে, তাহার সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা সাচ্চা মোসলমানেরই অনুরূপ হইয়াছে। আমি মনে করি বাংলা দেশের মুসলমানদিগের জন্য এইরূপ একখানি পত্রিকার বিশেষ আবশ্যক আছে। হয়তো ইহার

পরিগৃহীত নীতি অনেকের মনঃপুত হইবে না, ইহার সত্যবাদিতা অনেকের নিকট তিক্ত ও অসহবোধ হইবে কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হওয়ার কিছুই নাই।

['আরাফাত', ঐ, উদ্ধৃত সংক্ষেপিত]

লানা আবা খালেদ রশীদদ্দীন আহমদ (পীর বাদশাহ মিয়া)

আপনি এসলাম সমাজকে জাগরিত করিতেছেন সন্দেহ নাই, আপনার 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকাখানা এসলাম ধর্ম ও সমাজের কল্যাণকর তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিতেছি, খোদাওয়ান্দ পাক ইহাকে দীর্ঘজীবী করেন তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেছি। বঙ্গীয় মোসলমান ভাইগণ, . . . অধুনা মোসলমান সমাজে যে দুই একখানা পত্রিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছে বড়ই সুখের বিষয় যে, জনাব মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের সম্পাদিত 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকাখানা তন্মধ্যে অন্যতম . . . ইহা একদিকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বাক্যকে বুকে নিয়া আল্লাহ ও রসুলের বাণী প্রচার করিতে কোনরূপ সংকুচিত ও ভীত হইতেছেনা, অন্যদিকে এসলামিক ইতিহাস দ্বারা মোসলেম জগতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে আবার ইহার ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুমধুর।

[আরাফাত', ঐ. উদ্ধৃত]

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ
(সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ)

ভাষার উপর অসাধারণ পটুতা, বক্তৃতায় অসাধারণ শক্তি, মনের অসাধারণ জোর, নিজের সম্বন্ধে অসাধারণ বিশ্বাস এই নিয়ে মওলানা কাফী। 'সত্যাগ্রহী' যতবার হাতে নিয়েছি ততবারই মনে হয়েছে— এই কাগজটি সম্পাদকের সত্যিকার প্রতীক। বিজ্ঞাপনহীন এই কাগজ চিরকুমার, সংযোমী, কঠোর উচ্চচিন্তামগ্ন মওলানা সাহেবেরই মত।

['নিরীক্ষা' অক্টোবর ১৯৮৯; সম্পাদক, এনামুল হক, ৩, সার্কিট হাউস, ঢাকা, পৃঃ ১৮ থেকে উদ্ধৃত]

Reg. No. C. 1325

لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

সত্যাগ্রহী

(নব্য-তন্ত্রের সাপ্তাহিক)

সম্পাদক ঃ—মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৹	কলিকাতা, সোমবার ২০শে সফরুল মোজাফফর ১৩৪৮ হিজরী	ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক—৩৷৹
১ম বর্ষ	৩০শে আগষ্ট ১৯২৯ সাল, বাংলা ১৪ই ভাদ্র ১৩৩৬ সাল।	... সংখ্যা

গবেষণা বিভাগ

অমৃতাদি বটিকা

যাঁহারা বর্ষার পরেই ম্যালেরিয়া জ্বরে কাতর হইয়া পড়েন তাঁহারা এই সময় অমৃতাদি বটিকা সংগ্রহ করিয়া রাখুন। এই সময় আমাদের অমৃতাদি বটিকার এত কাটতি হয় যে পরে হয়ত তাঁহাদিগকে সময়ে দিতে পারিব না। কুইনাইন সেবনে যাঁহাদের জ্বর ছাড়ে না বা পুনঃপুনঃ জ্বরে যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা অমৃতাদি বটিকা সেবনে বিশেষ উপকার পাইবেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

[সত্যাগ্রহী কার্য্যালয়—১০।৩, মোসলমান পাড়া লেন] [প্রতি সংখ্যা ৴৹ এক আনা মাত্র

. আবদুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার আখ্যাপত্র

এম, এ, বারা
কর্তৃক
তানযীম প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আল্-ইসলাম
বনাম
কম্যুনিজম

প্রথম সংস্করণ
১৯৫৭ ইং, ১৩৭৭ হিঃ

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৭৭ ইং, ১৩৯৭ হিঃ

মূল্য—একটাকা পচিশ পয়সা

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

'আল ইসলাম বনাম কম্যুনিজম' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

'সত্যাগ্রহী' বন্ধ হবার* প্রায় ২২ বৎসর পর ১৯৫৬ সালে পাবনা থেকে তিনি নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন 'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস' পত্রিকা। ইসলামী ভাবাদর্শ পুষ্ট এই পত্রিকাখানি আবদুল্লাহেল কাফী তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পাদনা করেছিলেন। 'সত্যাগ্রহী' অপেক্ষা এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ভিন্নতর--ইসলামী আদর্শ ভাবধারা এবং শিক্ষা জীবনই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেন:

> পৃথিবীতে যাহারা প্রাধান্য করিতেছে, তাহারা কেহই আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বকে স্বীকার করে না এবং তাঁহার প্রদত্ত ও ব্যবস্থিত কর্মজীবনের নীতি ও বিধান মান্য করিয়া চলে না। ইহার ফলে মানবের অন্তর জগতে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দুঃখ ও অশান্তির প্রলয়শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দিকে দিকে অশান্তি, ও হত্যা কাণ্ডের বীভৎস লীলা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যভিচার, অনাহার, অত্যাচার, শোষণ ও পীড়নের নারকীয় উৎসবে শয়তান এবং তাহার অনুচর ও শিষ্যের দল মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ মৃত্যুমুখী দুনিয়া এবং তাহার অভিশপ্ত অধিবাসীবৃন্দকে উদ্ধার করিবে কে? ধ্বংসোন্মুখ মানবতাকে একমাত্র ইসলাম রক্ষা করিতে পারে।

এই পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাড়াও কবিতা, সাময়িক প্রসঙ্গ, চিঠিপত্রের জবাব প্রভৃতি বিভাগ ছিল। নিজের অসংখ্য রচনা ছাড়াও সমকালের অনেক নামী-দামী লেখকের রচনা ছাপা হয় এ পত্রিকায়। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার, ফজলুল হক সেলবর্ষী, মোহাম্মদ মওলানা বখশ নদভী, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), আবু ইউসুফ দেওবন্দী, শাইখ আব্দুর রহীম, আবদুল্লাহেল বাকী, সৈয়দ মুর্তজা আলী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ এম, আবদুল কাদের, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, কবি মুফাখ্খারুল ইসলাম, কবি

* 'সত্যাগ্রহী' বন্ধ হবার পর আবদুল্লাহেল কাফী মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত বাংলা দৈনিক 'সেবক'এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন বলে, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আকরম খাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৯)। এ বিষয়ে বিস্তৃত কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, কবি বে-নজীর আহমদ, আবুল কাশেম মুহম্মদ আদমউদ্দীন প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের অসংখ্য রচনা 'তর্জুমানুল হাদীসে' প্রকাশিত হয়।

'তর্জুমানুল হাদীস' পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক

(লেখক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)

প্রায় দুই যুগ পূর্বে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেবের যোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত "আল ইসলাম' নামক খ্যাতনামা মাসিক পত্রের পরে কোন ধর্মীয় মাসিক পত্র বাংলায় প্রকাশিত না হওয়ায় এক একবার মনে হইত, পাশ্চাত্যের চটকদার সাহিত্যিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার মুসলমান বোধ হয়, তাহাদের প্রাণের সাংস্কৃতিক প্রেরণার মূল উৎস হারাইয়া ফেলিয়াছে। 'তর্জুমানুল হাদীস'এর প্রথম সংখ্যা লাভ করিয়া দেখিতেছি, চেতনাহীন বাংলা ও আসামের মুসলমান এতদিনে তাহাদের হারানো আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া পাইয়াছে। আমাদের এই শিরক ও বিদত পরিপ্লাবিত 'গুমরাহ' বা বিপথগামী দেশে সাবেক ইসলামের আদর্শ ও নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা যে শুধু ধর্মীয় দিক হইতে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা নহে বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিক হইতেও ইহার আবশ্যকতা কতখানি কাম্য ও অভিপ্রেত, বলিয়া শেষ করা যায় না। ... আমার বিশ্বাস, বাংলা ও আসামে একমাত্র আহলে হাদীস আন্দোলনই সাবেক ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। 'তর্জুমানুল হাদীস' এই মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত ও আত্মত্যাগী আলিমের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করায়, যাহা মনে হইতেছে, তাহাকে নিজের কথায় প্রকাশ না করিয়া বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ভাষায় বলিতে হয়—

বাজলো কিরে ভোরের সানাই
নিদ্ মহলার আঁধার পুরে।
শুনছি আযান গগন তলে
অতীত রাতের মিনার চূড়ে॥

['আরাফাত', ২রা জুলাই ১৯৬২ থেকে উদ্ধৃত]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

(সাহিত্যিক)

. . . পত্রিকার Getup পরম সুন্দর হয়েছে—ভিতরের বিষয়বস্তুও তেমনি মনোরম। পাকিস্তানে এই প্রকার পত্রিকার দারুণ অভাব ছিল। আপনারা সে অভাব দূরকরণে সমাজের অশেষ উপকার হবে, এতে সন্দেহ নাই। গত দু'শ বছরে আমরা প্রকৃত ইসলাম হতে বহু দূরে সরে পড়েছি। ইসলামী লুপ্ত চেতনা আজ আপনাদের এই জীবন-কাঠির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক এই মোনাজাত করি আল্লাহর দরগায়।

['আরাফাত', ঐ, উদ্ধৃত]

মৌলবী হাসান আলী এম. এ. বি. এল

(প্রাক্তন মন্ত্রী)

আপনার নব প্রকাশিত 'তর্জুমানুল হাদীস' পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পাইয়া অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি। পাকিস্তানে ইসলামের পুনরভ্যুদয়ের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এই ধরনের মুসলিম সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সত্যাগ্রহী' সম্পাদনার বহুকাল পরে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অপরাপর প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আপনি যে আবার এই প্রকারের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন, সে জন্য আপনাকে অশেষ মোবারকবাদ জানাইতেছি এবং 'তর্জুমানুল হাদীস'কে অভিনন্দন করিতেছি।

['আরাফাত', ঐ, উদ্ধৃত]

আব্দুল্লাহেল কাফীর মৃত্যুর পর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী, ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা থেকে কিছুদিন 'তর্জুমানুল হাসীস' পত্রিকা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

আবদুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত সর্বশেষ পত্রিকার নাম সাপ্তাহিক 'আরাফাত'। ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর সোমবার ৮৬ নং কাজী

আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী জীবন বিধানই ছিল পত্রিকাটি প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য।

'আরাফাত'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আব্দুল্লাহেল কাফী লিখেছেন ঃ

> যাহারা আদর্শবঞ্চিত সাংবাদিকতার পক্ষপাতী তাহারা আমার এই প্রয়াসকে নিরর্থক বিবেচনা করিবেন। আমরা কিন্তু তাহাদের আদর্শহীন সাংবাদিকতা শুধু অনর্থক নয় অন্যায় বলিয়াও বিশ্বাস করিয়া থাকি। অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাবাধীন সংবাদপত্রের নীতি-ভ্রষ্টতাকে আমরা সাংবাদিকতার পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক এবং সাংবাদিক দুর্নীতি বলিয়া জানি... ধর্ম ও ফিকা বিশেষের আদর্শ নয়, আমাদের আদর্শ হইবে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ।... জবলে আরাফাতের উপত্যকায় পৃথিবীর সমুদয় মুসলমান যে আদর্শের বলে সকল বিভেদ ও বৈষ্যমে জলাঞ্জলি দিয়া একই জাতীয়তার আদর্শে মহীয়ান হইয়া উঠেন সাপ্তাহিক আরাফাত সেই আদর্শেই পাকিস্তানের জনগণকে অনুপ্রাণিত ও মহিমান্বিত করিতে চায়।

'আরাফাতে'র নিয়মিত কলাম জাহানে ইসলামে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খবরাখবর প্রকাশ করা হতো। অন্যান্য সাপ্তাহিকী অপেক্ষা 'আরাফাতে'র বিশেষত্ব ছিল লোকশিক্ষা দান এবং জনসাধারণকে নানা সমস্যার সমাধানের পথ-নির্দেশ করা। 'আরাফাতে'র সাফল্য সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক আবুল কাশেম মুহম্মদ আদমউদ্দীন লিখেছেন ঃ

> সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার মান হিসাবে 'আরাফাত'কে বিনাদ্বিধায় অবিসম্বাদিতভাবে প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকার শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আর এই শ্রেণীর যে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে 'আরা-ফাতের' মান উন্নততর একথা জোর গলায় বলা যায়। দেশী বিদেশী সংবাদচয়নে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও আলোচনায় সর্বত্র এই উন্নত মানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১]

আব্দুল্লাহেল কাফী মাত্র ৩ বৎসর 'আরাফাত' সম্পাদনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। নিজের বেশ কিছু রচনা ছাড়া অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনায় 'আরাফাতে'র পাতা ভরে উঠে।

উর্দু দৈনিক 'জমানা' সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীস' এবং সাপ্তাহিক 'আরাফাত'—এই ৪ খানি পত্রিকা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনা করে আব্দুল্লাহেল কাফী আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিশেষ করে মুসলিম সংবাদ সেবকদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে স্থান দখল করে আছেন। তিনি তাঁর নিরলস সংবাদপত্র সাধনার দ্বারা এদেশের মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ শোষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছেন তেমনি দ্বিধা বিভক্ত মুসলমান সমাজকে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ইসলামের অমিয়বাণীতে স্নাত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। আব্দুল্লাহেল কাফীর সাংবাদিক জীবনের দর্শনের মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন আসলে জাত-সাংবাদিক। সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের ভূমিকা সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। সাময়িকপত্রের আদর্শ এবং ভবিষ্যত কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেই আব্দুল্লাহেল কাফীর সাংবাদিক জীবন প্রসঙ্গের সমাপ্তি করছি। ১৯৫৯ সালের ৮ই মার্চ তারিখে ময়মনসিংহের টাউনহলের ছায়াবাণী হলে, পূর্ব পাকিস্তান সাময়িকী সম্পাদক সম্মেলনে তিনি সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দান করেছিলেন তারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

> সঠিক সংবাদ পরিবেশন করে জনগণের অভিজ্ঞতাপরিধি সম্প্রসারিত আর বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণকল্পে সহায়তা করাই সাংবাদিকতার চরম ও পরম লক্ষ্য নয়। আদর্শবাদী রাষ্ট্রের নাগরিকদের সঠিক আদর্শে সুগঠিত করে তোলাও সাংবাদিকতার মহত্তম লক্ষ্য। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে দৈনিক পত্রিকাগুলির চাইতে সাময়িক পত্রিকাগুলির দায়িত্ব ও গুরুত্ব অধিকতর। দৈনিক সংবাদপত্রের অপরিহার্যতা যেমন কোন সুসভ্য ব্যক্তি আর রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না; তেমনি সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল জাতি আর সভ্য রাষ্ট্রের কাছে সাময়িক পত্রগুলির প্রয়োজন আর মর্যাদাও অনস্বীকার্য।[১২]

সাহিত্য-সাধনা

কি রাজনীতি, কি সাংবাদিকতা সর্বত্রই উদ্দেশ্য ছিল একটিই—তা'হলো বাংলার মুসলমানদের সীমাহীন দুর্দশা লাঘব। তাঁর এই উদ্দেশ্য

এবং লক্ষ্য সাহিত্য সাধনায়ও পরিদৃষ্ট হয়। তবে তাঁর সাহিত্য চর্চায় প্রারম্ভিক কাল রাজনীতি ও সাংবাদিক জীবন শুরু করার পূর্বে, যখন বয়সে কিশোর আব্দুল্লাহেল কাফী মাদ্রাসার ছাত্র। তাঁর এই সাহিত্য চর্চার যাত্রাকাল সম্পর্কে কবি আব্দুল কাদির লিখেছেন ঃ

> মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালেই তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চায় অগ্রসর হন। ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা 'আল-এসলাম' পত্রিকায় তাঁহার লেখা 'অদৃষ্টবাদ' শীর্ষক একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়; তাহাতে বলেন ঃ

> মানবের উন্নতি ও অবনতি, সুখ ও দুঃখ তাহাদের কার্যের প্রতিফল স্বরূপ।... লাভ বা ক্ষতি যাহা হইবার তাহা সাধিত হইবে, উদ্যম ও তদ্বিরে তাহার ব্যত্যয় হইতে পারে না, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও মোসলেম সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।[১৩]

যৌবনে এসে রাজনীতি এবং সাংবাদিকতা শুরু করলে, তাঁর সাহিত্য সাধনার পথ উন্মুক্ত হয়। প্রচুর মননশীল প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন, যার প্রত্যেকটি সাহিত্য রসাশ্রিত অপূর্বসৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সর্বজনীনতার বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, স্পষ্ট এবং যুক্তিনির্ভর। সমসাময়িককালের সাহিত্যের বিষয়বস্তু তাঁর কাছে অন্তসারশূন্য মনে হয়েছে। তিনি একজন সাহিত্যকর্মী হিসেবে আধুনিক সাহিত্যের নৈরাশ্যপীড়িত অবসন্নতার দরুন ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাঁর ১৩৩৯ সালের ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা কার্তিক-এর 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার একটি রচনায় এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঃ

> আজিকার সাহিত্যে বর্ণিত মানুষকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহার জীবনের মর্মস্থলে কী এক অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আশ্রয় লইয়াছে যাহাতে তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি কিছুই তাহাকে প্রাণময় করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। কী এক সংশয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে এই মানুষের জীবনের গ্রন্থিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। মানুষ তাহার জীবনের উন্নততর, মহত্তর পরিণতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে। বাস্তবিকই জগতের কোন সাহিত্য আজ আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিতে পারিতেছে না . . . । . . . আজিকার সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষা

আছে; আশা নাই; ব্যাকুলতা আছে, বিশ্বাস নাই; সৌন্দর্য আছে সুস্থতা নাই। আধুনিক সাহিত্য মানুষের জীবনকে, তাহার জীবনের কঠিন সমস্যাসমূহকে রূপায়িত করিতেছে বটে—কিন্তু নিরাশার ভিতর দিয়া, সংশয়ক্লিষ্ট ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া। আজিকার সাহিত্য কোনখানেই মানুষের জীবনকে নবীন বিশ্বাসে সঞ্জীবিত করিবার সুরে বলিতে পারিতেছে না ঃ 'If winter comes, can spring be far behind'.

আব্দুল্লাহেল কাফী সাহিত্যচর্চা করেছেন নিছক আনন্দ সৃষ্টির বা আনন্দ দানের উদ্দেশে নয়; তাঁর লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মনীষীদের ন্যায় শাস্ত্র, ধর্ম এবং সামাজিক নানাবিধ প্রয়োজনে তার সফল প্রয়োগ ঘটান।

১৩৩৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচি-বিপর্যয়' শিরোনামে তিনি যে বিতর্কিত (?) প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের মুসলমানদের অবদান, সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা, মুসলমানী বাংলা জবানে রচিত পুঁথি সাহিত্য, বাঙালী মুসলমানের বৈষয়িক অধোগতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা থাকায়—আব্দুল্লাহেল কাফীর স্বতন্ত্র সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য চর্চার সূচনাকাল নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি তাঁর ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

> ১২০৩ খৃষ্টাব্দে গাজী মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ জয় করেন, কিন্তু তিনি এই কার্য সম্পূর্ণরূপে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়।...১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গ সমগ্রভাবে মুসলমানদের পদানত হয়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণের অধিকার ১৩২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোটের উপর ১২০৩ হইতে ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মুসলমান রাজত্ব কালকে যুগ সন্ধিক্ষণ বা Transitional period বলা চলে। সুতরাং বাংলাদেশে মুসলমানদিগের সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আর তখন হইতেই বাঙলার

মুসলমান রাজন্যবর্গ বাঙলা সাহিত্যের চর্চায় ও উন্নতি বিধানকল্পে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহেল কাফীর সাহিত্য সাধনার উল্লেখযোগ্য সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয় ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ রচনা এ সময় প্রকাশিত হয় নিজের সম্পাদিত 'তর্জুমানুল হাদীস' এবং 'আরাফাত' পত্রিকায়। রচনাগুলি পত্রিকায় প্রকাশের পরপরই তা গ্রন্থাকারে গ্রন্থিত করা হয়। এই সময়ে 'তর্জুমানুল হাদীসে' প্রকাশিত 'মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই প্রবন্ধে আব্দুল্লাহেল কাফী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণের দ্বারা বিবর্তনবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। একজন নাস্তিক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তিনি মজলিসী আলাপের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' পর্যায়ের রচনাগুলোর সঙ্গে আলোচ্য রচনাটির তুলনা করা যায়। কেবল বাংলা-সাহিত্যই নয়, বাংলা বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি এমনকি ভাষা প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাঁর লেখা 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে সেই চিন্তার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

> পূর্বপাকিস্তানে বাঙলাভাষার রূপ কেমন হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো হইতেছে। গোড়াগুড়ি হইতেই এই সম্বন্ধে দু'টি চরম-দল দেখিতে পাওয়া যায়, একদল ইহাকে সংস্কৃতবহুল আর অন্য-দলটি বাঙলাকে আরবী, ফার্সী শব্দবহুল করার পক্ষপাতি। এই টানাটানির ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষফোড়া বাঙলা সাহিত্যের সুদর্শন দেহকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা মনে করি, যে দেশের যে ভাষা, তাহাতে সে দেশের সকল অধিবাসীর তুল্য অধিকার থাকা উচিৎ। . . . কেহ কেহ বাংলাকে আরবী বর্ণমালায়, আবার কেহ রোমাণ বর্ণমালায় রূপান্তরিত করার পক্ষপাতি। বর্ণমালা এক একটি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বর্ণমালার প্রভাবে ভাষার কাঠামোটাই শুধু নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহার প্রভাব ভাষার মন ও মস্তিষ্ককেও

> নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।... বাঙলার যে বর্ণমালা রহিয়াছে, তাহাই থাকিবে, কেবল কয়েকটি বর্ণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাহাতে আরবী ফার্সী শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভবপর হয়।[১৪]

আব্দুল্লাহেল কাফীর রচনার সংখ্যা বিপুল। তাঁর সাহিত্যশৈলীর একটি বড় পরিচয় হলো কল্পনা কখনো তাতে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। তাই বলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য 'সাহিত্য রস বিবর্জিত' নয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় এই সংযোজনকে বর্জন করার কারোর কোন উপায় নেই। আব্দুল্লাহেল কাফী উচ্চারণ এবং বানান নিয়েও নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তি করেছেন বিভিন্ন রচনায়। 'বাংলা বর্ণমালা ও উচ্চারণ' প্রবন্ধের এক জায়গায় 'দন্ত স'কে যে আদৌ বাদ দেয়া সম্ভব নয় বাংলা ভাষা থেকে তার রসালো একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি ঃ

> দন্ত সকে বাদ দেওয়া চলতে পারে না। ইংরেজী S এর উচ্চারণে বাংলায় স্ত্রী জাতির স্নেহ রয়েছে, এর স্পর্ধা আরবেরও নেই, ইউ-রোপেরও নেই! মায়ের স্মৃতি জাগ্রত হলে আজও কি অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ হয় না? আর বাংলার আস্তিক হোক আর নাস্তিক স্নানে কারুরই অরুচি নেই আর স্রষ্টার প্রতি আস্থাকে একদম আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার জন্য কেউ ব্যস্ত নন। কাজেই আস্তে আস্তে দন্তস কে চির বিদায় দেওয়ার স্পৃহা আমাদের নেই। অবশ্য S এর উচ্চারণ বাংলায় শুধু দন্ত সএ সীমাবদ্ধ না রাখায় দন্ত স কে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এবং শ্রাবণের অশ্রুধারার দায়িত্ব তালব্য শএর ঘাড়ে ন্যস্ত দন্ত স শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আবার এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলার অধিকাংশ শব্দে দন্তস কে জাতিচ্যুত করে এক বিশ্রী ও অশ্লীল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটান হয়েছে, কিন্তু সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইংরেজী S এর উচ্চারণের জন্য বাংলার একটি বর্ণের আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারা যাবে না আর এর জন্য দন্তসকেই বহাল রাখা উচিত।

রচনার নিদর্শন

সাহিত্যের সুর

আধুনিক সাহিত্যের মানুষ আকাশের পানে তাহার শৃঙ্খলিত দুই বাহু তুলিয়া ব্যগ্র আকুল সুরে বলিতেছে, আলো চাই। মানুষের জীবনের উৎস-মূলে কী যেন এক অভাবনীয় বিপত্তি জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে, যেন তাহার জীবনের পাকে পাকে যত নৈরাশ্য ও বিড়ম্বনা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহারই গুরুভারে ক্লিষ্ট আজিকার সাহিত্যের মানুষ অবসাদের অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আলোক ভিখারী হইয়াছে। স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আধুনিক সাহিত্যে দারুণ অতৃপ্তির বেদনা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে —যেন জীবনের পথে চলিতে চলিতে মানুষের চলার সঞ্চয় ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহার মনে আজ ক্লান্তি আসিয়াছে, অবসাদক্লিষ্ট বিষণ্ণতা তাহাকে নিরন্তর ব্যথিত করিতেছে; এ যেন কোলরিজের সেই মহাসমুদ্রের বুকে পথভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত নাবিক, যাহার চারিদিকে সীমাহীন জলধির বিস্তার, অথচ এক বিন্দুও জল পান করিবার উপায় নাই। আজিকার সাহিত্যে বর্ণিত মানুষকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহার জীবনের মর্মস্থলে কী এক অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আশ্রয় লইয়াছে যাহাতে তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি কিছুই তাহাকে প্রাণময় করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। কী এক সংশয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে এই মানুষের জীবনের গ্রন্থিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছে। মানুষ তাহার জীবনের উন্নততর, মহত্তর পরিণতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে। বাস্তবিকই জগতের কোন সাহিত্য আজ আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়া বলিতে পারিতেছে না: “মানুষ তুমি না দুঃখ সহিতেছ! যত বেদনা তোমার জীবনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, এ সকলের কিছুই ব্যর্থ হইবে না, তোমার দুঃখের তমসা ভেদ করিয়া নব-দিবসের অরুণ রাগ দেখা দিবেই।” এই ভবিষ্যৎ কল্পনা, মানুষের জীবনের বৃহত্তর পরিণতির

এই ইঙ্গিত, যাহা বিশেষ বিশেষ কালে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্যে তাহা দুর্লভ। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যে সমগ্র ভাবেই সংশয় ও বেদনার সুর বাজিতেছে। সত্যই দেখিতেছি, আজিকার সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষা আছে, আশা নাই; ব্যাকুলতা আছে, বিশ্বাস নাই; সৌন্দর্য্য আছে, সুস্থতা নাই। আধুনিক সাহিত্য মানুষের জীবনকে, তাহার জীবনের কঠিন সমস্যা সমূহকে রূপায়িত করিতেছে বটে—কিন্তু নিরাশার ভিতর দিয়া, সংশয়ক্লিষ্ট ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া। আজিকার সাহিত্য কোন খানেই মানুষের জীবনকে নবীন বিশ্বাসে সঞ্জীবিত করিবার সুরে বলিতে পারিতেছে না; "If winter comes can spring be far behind."

"নিদারুণ দুঃখ রাতে,
মৃত্যু হাতে,
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখনো দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

আধুনিক সাহিত্যের ভাব-প্রবাহের সহিত পরিচিত হইলে দেখা যায়, আনন্দোচ্ছল গতিবেগ ইহার বিশেষত্ব নয়, মৃত্যুপাণ্ডুর নিঠুরতা এই সাহিত্যের রূপ-নিদর্শন। আজিকার কবির কণ্ঠে তীব্র বেদনার গীতি ধ্বনিয়া উঠে:

আমার পরাণ নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' আকাশ হয়েছে নীল,
রহেনি কোথাও ফাঁক,
আমার পরাণে জমেছে বিশ্ব-বেদনার মৌচাক।
অন্ধকারের কাতর কাকুতি, ঝরা মুকুলের ব্যথা,
দীর্ঘশ্বাসের দরিয়া দুলিছে মরুভূর শূন্যতা,
আমার পরাণ ভার
মূর্চ্ছিত আছে যুগান্তরের মৃত্যু বিভাবরী।"

প্রশ্ন হইতেছে আধুনিক সাহিত্যের এই নৈরাশ্যপীড়িত অবসন্নতার কারণ কি? একই যুগে একই সময়ে বিশ্ব-সাহিত্যের ধারায় এই বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে কেন? ইহা আলোচনা করিবার পূর্বেই বলিয়া রাখি, সাহিত্য-সমালোচকের চিরাভ্যস্ত দৃষ্টিভূমি হইতে সাহিত্যের রস

বিকীর্ণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধকে জানিবার জন্যই সাহিত্যের যুগ-লক্ষণগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে চাহিতেছি। দেখাইতে চাই যে, আধুনিক সাহিত্যের এই বিশিষ্টতা কোন অলৌকিক শক্তির লীলারূপে সাহিত্যিকের স্বাধীন রুচির বিকাশানুযায়ী দেখা দেয় নাই, সাহিত্যের ভাবাদর্শ ও প্রকাশ-ভঙ্গিমার মূলগত বৈশিষ্ট্য সর্বদাই সমাজের গতি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

আধুনিক সাহিত্যের এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আদর্শবাদীরা বলিবেন, যে-বিশেষ ভাব আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের মনকে প্রভাবিত করিয়াছে, যুগ-সাহিত্যে তাহাই প্রতিপালিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন: "পৃথিবীতে এক একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানব-সমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অবশ্য সভ্যতার তারতম্যানুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হওয়াটা একই। সমস্ত মানুষের মনের সঙ্গে সকলের মনের একটী অখণ্ড যোগ আছে, তাহার এক জায়গায় যে-শক্তির ক্রিয়া ঘটে, অন্যত্র গূঢ়ভাবে তাহা সংক্রমিত হইয়া থাকে।"

কিন্তু কেন যে বিশেষকালে বিশেষ একটী ভাব সর্বত্রই সংক্রমিত হয়, তাহার মৌলিক কারণ আদর্শবাদীগণ নির্দেশ করেন না। হয়ত কেহ কেহ ইহাকে কোন চিরন্তন অদৃশ্য শক্তি বা বিশ্বসত্বার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের সম্বন্ধ নির্দেশ করিতে গিয়া এই প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

Mathew Arnold সাহিত্যকে criticism of life বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাহিত্য জীবনের সমালোচনা; জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ দৈন্যকে ছন্দে ও ভাষায় মুখর করিয়া তোলায় সাহিত্যের সার্থকতা। যে-ভাবধারা সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত, তাহা মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্যই সাহিত্যের ক্রম-পরিবর্তনের কারণ দেখাইতে বসিয়া বস্তুনিরপেক্ষ লোকাতীত কোন শক্তির লীলাকে আমরা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। আজিকার সাহিত্যের এই যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ ইহার মধ্য দিয়া কোন দেহহীন আত্মার লাবণ্য ক্ষরিয়া

পড়িতেছে না। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার জীবনের বিরোধ বাঁধিয়াছে, অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে বলিয়াই এই ব্যগ্র ব্যাকুলতা —এই সংশয়-দগ্ধ মনোবেদনা মানুষের অন্তর মথিত করিয়া তুলিতেছে। সাহিত্যিকও তো সামাজিক মানুষ; সেই হিসাবে সমাজ-জীবনের বিচিত্র তরঙ্গাভিঘাত সাহিত্যিকের মনকে স্পর্শ করিবেই। সাহিত্যিকের অসীম নীলিমাভিয়াসী কল্পনা যখন লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত উর্ধ হইতে উর্ধতর আলোক রাজ্যের সন্ধানে ব্যস্ত, তখনও তাহাকে কল্পলোক ও প্রতি দিবসের এই বাস্তব লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইতেছে। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ভাষায় ture to the kindered spirit of heaven and home— মানস রাজ্য ও বাস্তব জীবন—এই উভয়ের মিলনে সাহিত্যিকের রসসৃষ্টি সার্থক ও সুন্দর হয়।

দেখা যাইতেছে, আমি সাহিত্যিকের ধারণা-সীমাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলাম, বহুকাল ধরিয়া সাহিত্যিকের মানস লোক সম্বন্ধে যে রহস্য-জাল রচিত হইয়াছে, আমি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছি, সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা সাহিত্যের ভাব-লোককে একটী সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছি। কিন্তু একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, কবি ও সাহিত্যিক সমাজের আদর্শবাহক মাত্র, অথবা সমাজের দশ জনের যাহা ভাবনা সাধনা সাহিত্যিকের কল্পনাও অন্ধভাবে তাহারই অনুসরণ করিয়া রসসৃষ্টি করে। বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার প্রাণহীন রোমন্থন প্রকৃত সাহিত্যের ধর্ম নয়। এ জীবনের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের বাস্তবতাকে কল্পনার আলোক মালাতে উজ্জ্বল করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ; সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের মূল্য এই খানে। যেখানে আলো পড়ে নাই, সেখানে আলো ফুটাইয়া তোলা যেখানে সাধারণ মানুষের কল্পনা শুধুই ব্যবধান ও বিভেদ দেখিতেছে, সেখানে সমগ্র রূপের ঐক্যটিকে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা কেবল মাত্র সাহিত্যিকেরই আছে, কারণ সাধারণ মানুষের সহিত তাহার পার্থক্য শুধু এইখানেই যে, সাহিত্যিকের অনুভূতি তীব্র, কল্পনাশক্তি প্রখর। সাহিত্যিকের কল্পনাশক্তি কেবলমাত্র জীবন যাত্রার বিভিন্নমুখী গতির খণ্ডরূপ দেখিয়া তৃপ্ত হয় নাই, জীবনের সমগ্ররূপ ও বৈচিত্রের গতি সমগ্রভাবে তাহার নিকট প্রতিভাত

হইয়াছে। যে প্রখর কল্পনাশক্তি সাহিত্যিকের তীব্র চেতনাবোধের বৈশিষ্ট্য, তাহাই সমাজের সমষ্টিগত ভাবধারাকে উজ্জ্বল ও প্রাণময় করিয়া সাহিত্যের মায়ালোক রচনা করে। এই হিসাবে সাহিত্যিক যুগ-প্রকাশক। সাহিত্যিক কোন বিশেষ যুগের সাহিত্যকে, সেই সময়ের ভাবধারাকে, তখনকার মানুষের জীবন যাত্রার বৈশিষ্ট্যকে তীব্র অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহার সুসমঞ্জস রসঘন রূপ-রস-পিপাসুগণের সম্মুখে ধরিয়া দেন। সমাজ জীবনে ইহাই সাহিত্যিকের বিশেষ ভূমিকা। কিন্তু আদর্শবাদিগণের মতে সাহিত্যিক যুগ-স্রষ্টা, কোন এক বিশেষ কালের মোহনায় দাঁড়াইয়া যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক যখন নব আদর্শের বাণী ঘোষণা করেন, তখনই যুগপ্রবর্তন আরম্ভ হয় এবং নব-ভাবের প্লাবনে মানুষের জীবন ধারা ও জীবনাদর্শ পরিবর্তিত হইয়া যায়। আদর্শবাদিগণ সাহিত্যিকের এই অতিমানুষিক ক্ষমতায় বিশ্বাসবান। যেমন দেখা যায়, ইহাদের মতে ফরাসী বিপ্লব যে নবযুগ প্রবর্তন করিল, তাহার মূলে রহিয়াছে রুশো ভল্‌টেয়ারের সাহিত্য। এই মত অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন; "যেদিন Le contract social প্রচারিত হইল, সেদিন ফরাসী রাজার হস্তে রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। Le contract social গ্রন্থের চরম ফল ষোড়শ লুইএর সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাণ-দণ্ড।" সাহিত্যিকের এই যুগস্রষ্টারূপ পরিকল্পনাকে অবতারবাদের প্রকারান্তর বলিলে অন্যায় হইবে না; কিন্তু সমাজ-চিত্ত তো কোন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা নয় যে, বিশেষ একটি ব্যক্তির সোনার কাঠির স্পর্শেই তাহার চিত্তবৃত্তির সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়িয়া নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে! যুগে যুগে সমাজের অন্তর্গত শক্তিসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে, পরস্পর-বিরোধিতায় মানুষের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নানা দুঃখ, নানা সমস্যা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে; সমগ্র ভাবে সমাজ যতদিন এই অসামঞ্জস্য ও বিরোধকে ধারণ করিয়াও বাড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে, ততদিন সাহিত্যও সমাজের মূলগত ভাবধারাকে কেন্দ্র করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছে। যখন সমাজের অন্তর্বিরোধ দুঃসহ ও দুর্বহ হইয়া সমাজকে নূতন ভাবে দৃঢ়তর বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্খাকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে, তখন সাহিত্যিকের মানস-রাজ্যেও নবীন ভবিষ্যৎ গড়িবার কল্পনায় বিশ্বাস-প্রদীপ্ত ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

ও গতি বৈশিষ্ট্যের সহিত সাহিত্যের ভাবধারার যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার পূর্বে কয়েকটী যুগ-সাহিত্যের লক্ষণ ও তৎকালীন সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া দেখিতে চাই। এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ককে সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে; কয়েকটী যুগ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেখাইলে সমাজ ব্যবস্থার উপর সাহিত্যের নির্ভরশীলতা স্পষ্ট-ভাবে বুঝা যাইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের মধ্যে অবিশ্রাম সংঘাত চলিতেছে। এই সংঘাত বাস্তব জীবনের এবং ইহার মূল কথা হইতেছে জীবন ধারণের জন্য সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন স্তরের ঘাত প্রতিঘাত। সমাজের কোন মানুষের এই সংগ্রামকে এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই---সাহিত্যিকেরও নয়। এই অন্তর্বিরোধে যে শ্রেণী উন্নততর স্থান অধিকার করিয়া সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শ্রেণীই জীবন সংগ্রামের কঠোর পরিশ্রম হইতে অবসর বাঁচাইয়া রসসৃষ্টি করিবার ও রস উপভোগ করিবার সুযোগ পায়। সাহিত্য রসের সামগ্রী, এই রসসৃষ্টি করিবে যাহারা এবং রস উপভোগ করিবে যাহারা, তাহাদের উভয়েরই চাই অবসর। কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য যাহাদের দেহ বিক্রীত, মন সর্বক্ষণ নিযুক্ত, তাহাদের সূক্ষ্মতর বৃত্তিসমূহের অনু-শীলনের সময় কোথায়? এস্কিমো বা জুলু সমাজে সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙলার মুসলমান সমাজেরও কোন উল্লেখযোগ্য দান নাই, অথচ সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে অধিকার সম্পন্ন মুসলমান সাহিত্যিক শ্রেণীর প্রতিভার কথা অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বেও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ আবহমান কাল হইতে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে সেই সমাজে যেখানে শ্রেণী বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কেবলমাত্র জীবন ধারণের সমস্যা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে। এই জন্য সকল যুগের সকল সমাজের সাহিত্যই শ্রেণী-সাহিত্য, বিশেষকালে বিশেষ সমাজে ক্ষমতাশালী শ্রেণী যে সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, সাহিত্যিক তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সেই শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খা, নীতিবোধ প্রভৃতিকে সাহিত্যের বিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া রসসৃষ্টি করে।

"শেষের কবিতা"র অমিতকে যদি মার্টিন কোম্পানীর কেরাণী ও লাবণ্যকে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্প শিক্ষিতা তরুণী-রূপে কল্পনা করা যায়; তবে কথাশিল্পীর অনির্বচনীয় ভাবরস হাস্যরূপে পরিণত হইবে। "শেষের কবিতা'য় যে-সমস্যাকে রসাভিষিক্ত করা হইয়াছে, বিবাহ বন্ধনাতীত প্রেমের মানসমিলনাকাঙ্ক্ষা কথা সাহিত্যে যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে—তাহা এখনও প্রধানতঃ শ্রেণীবিশেষের সমস্যা ও স্বপ্ন। কবি-প্রতিভা ও ইহাকে অস্বীকার না করিয়া অমিত ও লাবণ্যকে অভিজাত শ্রেণীর আবেষ্টনীর মধ্যেই গড়িয়া তুলিয়াছেন।

ইউরোপেও দেখি, যখন জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় নারীকে স্বাধীনতা দিবার প্রয়োজন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই সেই ভাবকে আশ্রয় করিয়া ইবসেনীয় সাহিত্য নারী-বিদ্রোহের আদর্শকে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। এখন আর নারী স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়, কারণ মহাযুদ্ধের পর নারী স্বাতন্ত্র্যের দাবী ইউরোপে Settled fact রূপে গৃহীত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে বিবাহ-ব্যাপারে সমাজ বন্ধনের কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর বাজিতেছে। দায়িত্ববিহীন বিবাহ এর আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আধুনিক সাহিত্যের একটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার কারণটী অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজ-চিত্ত আজ নানাবিধ সমস্যার ভারে অবসন্ন। বেকার-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা ও অর্থসঙ্কট যে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার ফলে ইউরোপীয় সমাজ-চিত্ত দিশাহারা ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, যে অভিজাত শ্রেণী সমাজ-ব্যবস্থাকে এখনও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার বিঘ্নহীন স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সেই শ্রেণী আজ নিজেই সন্দিহান। আসন্ন বিপ্লবের ভয়ে সমাজ শাসকশ্রেণী কাতর, অর্থনৈতিক সমস্যার পীড়নে তাহার জীবন অশান্তিময়। এই সঙ্কট সময়ে পরিবার প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার অনিচ্ছা অভিজাত শ্রেণীর মনে জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক সমস্যা পরিবারের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়াছে বটে, কিন্তু দৈহিক কামনার তো নিবৃত্তি নাই। দায়িত্ববিহীন বিবাহের আদর্শ এই জন্যই আজ ইউরোপীয় সমাজ চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে।

সাহিত্যও এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিদ্রোহের সুরে বলিয়াছে, "বিবাহ বন্ধনের এই অর্থ হীন অত্যাচার মানুষের আত্ম-প্রসারণকে পদে পদে খর্ব করিতেছে তাহাকে ভাঙ্গিতে হইবেই।"

সাহিত্যের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য দেখাইতে গিয়া যাহা বলা হইল, সমাজের অতিবৈচিত্র্যের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক বিচার করিতে গেলেও তাহাই সমর্থিত হইবে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজ ও সাহিত্যের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি, এই যুগের ইউরোপীয় সমাজে আহার বিহার বসনের উপকরণ যোগাইবার ভার অধিকার বঞ্চিত গোলাম শ্রেণীর, আর সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ডিউক, ব্যারণ, নাইট প্রভৃতি অভিজাত-গণের। এই সমাজ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগের সাহিত্য, চিত্রকলা ও ধর্মের বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্য শিভ্যালরী (Chivalry)র সাহিত্য—নারীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জনপরায়ণ নাইটগণের বীরত্ব গাথা, ধর্মযুদ্ধে রত সামন্তগণের গৌরব গান এই যুগের সাহিত্য লক্ষণ, সামন্ত রাজসভা-পালিত চারণ কবিগণ রচিত গাথা ও ধর্মমূলক এপিক কাব্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব। লিরিক বা গীতি কবিতা এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। গীতি-কাব্য মানুষের আত্মগত সুখ দুঃখের প্রকাশ। মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় মানুষের আত্মপ্রসারণের ও আত্মসম্মান-বোধ লাভের স্থান কোথায়? ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া মানুষের মূল্য কানাকড়িও নয়, এক খৃষ্টান-মণ্ডলীর অধিপতি পোপের পুত্র হিসাবে তাহার মূল্য নিরূপিত আর সামন্ততন্ত্রের পরিপোষক ডিউক, ব্যারণ, প্রিন্সের ক্রীতদাস হিসাবে তাহার প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে মানুষের দৃষ্টি প্রমাণিত করিতে গেলে চার্চ তাহার গলা টিপিয়া মারিবে। এইজন্যই 'শিভ্যাল্‌রী'র সাহিত্যে ব্যক্তিগত মানুষের মিলন-বিরহ-কামনাকে আশ্রয় করিয়া গীতিকাব্য রচিত হইতে পারে নাই।

পরবর্তী যুগলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রচালিত সমাজের অন্তর্বিরোধ যখন প্রবল হইয়া সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরিল, নগরকে আশ্রয় করিয়া যখন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিল, যখন নবীন

বণিক-সভ্যতা সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নব-নির্ম্মানের আয়োজন করিল, ইউরোপীয় চিন্তাধারাতেও তখন নব-ভাবের প্লাবন আসিল। ইহাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রেনেসাঁ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রেনেসাঁ নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক শ্রেণীর ভাবনা সাধনার আনন্দদীপ্ত ব্যঞ্জনা। রেনেসাঁস যুগের মানুষ যেমন একদিকে অধীর উৎসাহে তরণী সাজাইয়া মহাসমুদ্রের দিকে দিকে পাড়ি দিয়াছে বাণিজ্য বিস্তারের আশায়, নব নব স্বর্ণভাণ্ডার অধিকারের আগ্রহে তেমনি যুগ সাহিত্যও তখন নব-জাগ্রত শ্রেণীর এই বিপুল বলদৃপ্ত গতিবেগকে ছন্দে, বর্ণে, সঙ্গীতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেক্সপীয়রের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই দিনেরই নৃত্যলীলা।

দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক যুগে প্রথমে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের জীবনধারা প্রচলিত গতিপথ ছাড়িয়া ভিন্নমুখী হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিচালনে অধিকার সম্পন্ন শ্রেণীর চিন্তাধারার সহিত মিল রাখিয়া সাহিত্যের ভাবধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যও যে এই একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের ধারাকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে লক্ষ্য করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কবি ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দু সাহিত্যিকগণের শেষ রত্ন। ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত হিন্দু বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার সময় ইসলামী শাসনের পরিবর্ত্তে এই যুগে নব প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক খৃষ্টান রাজশক্তিকে সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার চেষ্টায় হিন্দু বাঙালীর সমাজচিত্ত গভীরভাবে নিযুক্ত। এই সময়ে জীবন ধারণ ও সংরক্ষণের চিন্তাই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তখনকার হিন্দু বাঙালী রসসৃষ্টি করিবার অবকাশ পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা-লব্ধ-উপকরণ দিয়া সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আনিতে লাগিল এবং এই সময়ের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিয়া নব ধারা-পুষ্ট বাঙলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যশালী হইয়া উঠিল।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে-শ্রেণী সমাজ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই শ্রেণীর উন্নতি-অবনতিকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যের বিষয় বিশেষ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। কোন সদ্যপ্রবুদ্ধ শ্রেণী যখন সমাজকে আপনার প্রয়োজনমত গড়িয়া লইবার উৎসাহে কর্ম্মতৎপর, তখন তাহার সাহিত্যেও বাজিয়া উঠে অসীম বিশ্বাসের সুর, উন্নতশীল তরুণ মনের উৎসাহদীপ্ত কর্ম্মোন্মাদনা তখন সাহিত্যের মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ ও আশার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা পরিচালনের স্থান অধিকার করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু যে দিন সচেতন হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার জীবন, তাহার ভাবনা-সাধনা সকলই নিযুক্ত হইয়াছে এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য। সমাজ ব্যবস্থায় আপনার ন্যায্য দাবী বুঝিয়া লইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু যেমন পাশ্চাত্য আদর্শে আপনার সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নততর, দৃঢ়তর করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বাংগীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অস্বীকার করিবার জন্য myth বা ধূয়া সৃষ্টি করিয়াছে ভারতীয় কালচারের। বিজেতা ক্ষমতাধিকারী শ্রেণীর সমকক্ষতা প্রমাণ করিবার জন্য শিক্ষিত হিন্দু ভারতীয় কালচারের শ্রেষ্ঠত্ব মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে। তাহারই ফলে বাঙলার এই শ্রেণী সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছে প্রাচীন ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া। অ্যাংলো-বাঙলার হিন্দু অভিজাতশ্রেণী তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীর যুক্তিসংগতি ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করিবার জন্য কল্পনা করিয়াছে যে, জগতের ইতিহাসে হিন্দুর একটী বিশেষ মিশন আছে এবং সেই মিশনকে সার্থক করিবার বিরাট আদর্শ এই শ্রেণীর সকল প্রকার লৌকিক কর্ম্মকে নৈতিক সমর্থন দিতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভারতের এই বিশেষ মিশনের বাণী ধ্বনিত হইয়াছে :

> "সেই সাধনার সে আরাধনার
> যজ্ঞ শালার খোলা আজি দ্বার
> হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে
> আনতশিরে
> এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

যে-শ্রেণীর আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যিক সাধারণতঃ প্রতিপালিত যে-শ্রেণীর ভাবধারায় সাহিত্যিক পরিপুষ্ট, সমাজ ব্যবস্থায় সেই শিক্ষিত হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম স্থান লাভের আকাঙ্খা বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের হিন্দু সাহিত্যিকগণের রচনায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রিক অধিকার লইয়া হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর সহিত বিজেতা রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই সময় হইতেই শুরু হইয়াছিল। তাই যখন 'আনন্দ মঠে' জীবানন্দের মুখে শুনি, "আজ বড় আনন্দ, টিলার ও-পিঠে এডওয়ার্ডস সাহেব যে আগে টিলার উপর উঠিবে, তাহারই জিত।" তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, বাস্তব জীবনে ঐরূপ অসংখ্য টিলার অধিকার লইয়া জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রে ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে আকাঙ্খা হিন্দু বাঙালীর মনে তীব্র হইয়া উঠিতেছিল এ তাহারই সাহিত্য-রূপ। যে নবীন আকাঙ্খা লইয়া নব জাগ্রত নব-অভিজাত শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থায় কর্তৃত্বলাভ, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মধ্যে উহা নিঃশেষিত হয় নাই। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর জীবনী শক্তি সমাজের বিভিন্ন বিভাগে প্লাবন আনিয়াছিল। সমাজ বা শ্রেণী বিশেষের মানুষের মন যখন ব্যক্তিত্ববোধে প্রবুদ্ধ হয়, নিজস্ব সত্বার প্রতি শ্রদ্ধা যখন জাগিয়া উঠে, তখন এই আত্মচেতন-বোধ সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়—"মোটামোটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্য্যের দিক, তাহা জীবন সমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক তাহা অবিরাম গতি চাঞ্চল্য; আর একটী দিক আছে যাহা আকাশ নীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্ত রেখার অসীমতার নিস্তব্ধ আভাষ"—(রবীন্দ্রনাথ)। সংক্ষেপে বলিতে গেলে রোমান্টিক সাহিত্যের দুইটি লক্ষণ—অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহ ও অসীম বিশ্বাস, দীপ্ত ব্যাকুলতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্য্যন্ত যে সদ্য-উদ্বুদ্ধ অভিজাতশ্রেণী সমাজ ব্যবস্থাকে নিজ প্রয়োজন মত গড়িবার আগ্রহে কর্মচঞ্চল হইয়াছিল, তাহার বাধাবন্ধনহীন গতিশীল প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা সাহিত্য গীতিকাব্যে, সঙ্গীতে ও নাটকে অপূর্ব রোমান্টিক রসসৃষ্টি করিয়াছিল, এই সময়ের সহিত সব কিছুর মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্য দেখিয়াছে; দুঃখ ও বেদনার মধ্যেও মহা-ভবিষ্যতের বীজ অঙ্কুরিত হইবার বাণী বহন

করিয়া আনিয়াছে। এই আত্মবিশ্বাসই নব-আশায় সঞ্জীবিত সাহিত্যের মূল সুর ঃ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গান সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরকার। বিশ্ব-জীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আবেদন।" এই যুগের সাহিত্যে রূপকের মধ্য দিয়াও উন্নত শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লওয়া যাক ঃ

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে কাঙ্গালিনী মেয়ে।"

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা এই ঃ "যেসব সমাজে ঐশ্বর্য্যশীল স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানেই সানাই রাজিয়া উঠিয়াছে ; সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই। আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র। সাজ করিয়া আসিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম কৈ ?"

শ্রেণী বিশেষ যখন সমাজের উচ্চতম স্তরে গৌরবময় আসন অধিকার করিবার আগ্রহে অধীর, তখন বৈচিত্র্যহীন পোষমানা জীবনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের ভাব ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? এই বিদ্রোহের ভাব এই সময়ের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম দান রবীন্দ্র কাব্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরব বেদুইনের সাজে বিশাল মরুভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইবার দুর্নিবার আশা শ্রেণীবিশেষের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণুতার প্রতিধ্বনি, রবীন্দ্রনাথের আত্মগত ভাব এখানে অভিজাত শ্রেণীর তৎকালীন মনোভাবকে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে ঃ "মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্খা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব, যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়

একটি অধৈর্য্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত, আমার প্রাণ বলিত—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।'

আশার সুর হিসাবেও দেখি ঃ

"হবে হবে হবে জয়, হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী,
তোমার আহবান বাণী, সফল করিব আমি,
হে মহিমাময়ী।"

কবির এই বিশ্বাসদীপ্ত বাণী স্বাধিকার লাভে চেষ্টিত বাঙালী হিন্দু অভিজাত শ্রেণীরই অন্তরের আশ্বাসবাণী।

কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক সাহিত্যেরই প্রকাশ ভঙ্গিমার আদি, মধ্য ও অনন্তকাল আছে। একই যুগের গণ্ডির মধ্যে সাহিত্যের এই প্রকারান্তর নির্ভর করে ক্ষমতাধিকারী শ্রেণীর উন্নতি-অবনতির গতির উপরে। হৃতসর্বস্ব, গৌরবচ্যুত, ভূলুণ্ঠিত শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে প্রাণ প্রবাহের স্পন্দন ও বিশ্বাসরঞ্জিত সুরের কূজন অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিরর্থক। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক সাহিত্য 'স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার যে উদ্দামতা দেখিয়াছিল', তাহা সদ্য-প্রবুদ্ধ আত্মবিশ্বাসপরায়ণ ফরাসী নাগরিক শ্রেণীর প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রতিচ্ছবি। "ইউরোপীয় চিত্তের এই চাঞ্চল্য, এই নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেখানকার ইতিহাস হইতেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সেখানে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল বলিয়াই ঝড়ের গর্জনও শোনা গিয়াছিল।" রোমাণ্টিক কল্পনার অসীমতা ও প্রাণপ্রবাহ বাঙলা সাহিত্যেও বিপুল ও প্রখরগতি হইয়াছিল সেই সময়ে, যখন বাঙলার সমাজের হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর জীবনে নবজন্মের সাড়া পড়িয়াছিল। বাঙলা সাহিত্যের রেনেসাঁস বাঙলা হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থান ও উন্নতির ইতিহাস। এই উন্নতির-যুগের সাহিত্যে কিছুমাত্রও কুণ্ঠা নাই, কার্পণ্য নাই, কোথাও সন্দেহ বা নিরাশার অবকাশ নাই। এই সাহিত্যের মূলকথা ঃ

"আমি যে সব নিতে চাইরে,
আপনাকে আজ মেলব যে বাইরে—"

উৎসাহচঞ্চল তরুণ হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর কর্ম্মাদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে রূপকের ভাষায়—"এইটেই হচ্ছে মানুষের সব গোড়াকার কথা আর সব শেষের, পৃথিবীতে যারা নূতন জন্মেছে, দিদিমার কাছে তাদের চির-কালের খবরটী পাওয়া চাই যে রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জ্জয়, আর ছোট মানুষটী একলা দাঁড়িয়ে পণ করেছে,—বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনবে।"

বাঙলা সাহিত্যের যুগান্ত কালের কথা বলি। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বাঙলা সাহিত্যের এই রোমান্টিক রূপের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের অংশ মাত্র। মহাযুদ্ধের ফলে বাঙলা দেশের সমাজেও অন্তর্ব্বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সমস্যার পর সমস্যা আসিয়া সমাজ-পরিচালক অভিজাত শ্রেণীর অবস্থাকে অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত যে তরুণ অভিজাত শ্রেণীর দ্রুত উন্নতি পৃথিবীর সকল সমাজের বিশেষত্বরূপে দেখা গিয়াছিল, তাহার স্থায়িত্ব আজ অনিশ্চিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত নিম্নশ্রেণী সমূহের বিরোধিতায়, নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আজ ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর মরণদশা উপস্থিত। এই শ্রেণীর মানুষের জীবনে এখন একটা ভীতিময় ব্যাকুলতা আসিয়াছে, অন্তর্বিরোধকে চাপা দিয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্নে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। অতি আধুনিক সাহিত্য এই সংশয়, এই নিরাশাপীড়িত বেদনার বাণী বহন করিয়া আনিয়া বাস্তব জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্বকেই ভাষা দিয়াছে। অভিজাতশ্রেণীর জীবনধারায় যে নিম্নমুখী গতি দেখা দিয়াছে, তাহারই ছন্দ আধুনিক সাহিত্যিকের রচনার মরণোন্মুখ রাজহংসের গতিরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও এইভাবে সামাজিক গতিকে অনু-সরণ করিয়াছে। বাঙলার সমাজে আজ উচ্চতর শ্রেণীর জীবন অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের ফলে অনিশ্চিত হইয়াছে। সমাজের অন্তর্গত শ্রেণীসমূহের সম্পর্কের মধ্যে পরস্পর আর সামঞ্জস্য থাকিতেছে না, হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া যে 'মায়ালোক' সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, সমাম-ব্যবস্থায় ভাঙ্গনের পূর্বাভাষ দেখা দিয়াছে। উচ্চতর শ্রেণীর অনিশ্চয়তা, নানা বিরোধী শক্তির সংঘাত—এই সমস্ত

মিলিয়া সমাজের কেন্দ্রগত ভাবধারাকে নৈরাশ্যময় ও বেদনাতুর করিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের সুর এইজন্যই হতাশার সুর। অতি-ভোগ-ক্লিষ্ট দিশাহীন মন আজ মরণাকাঙ্খার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিতেছে, সমাজ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মনের অস্থিরতাকে ব্যক্ত করিতেছে। আজিকার সাহিত্যের এই নৈরাশ্যবাদ, এই মৃত্যুবিলাস, এই পরিতৃপ্ত দৈহিক কামনার কূজন সমস্তই মরণোন্মুখ সমাজের সমষ্টিগত ভাবাদর্শের প্রতিধ্বনি। বাহিরের সঙ্গে জীবনের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজিকার মানুষের মনের অনির্দিষ্ট বেদনার সুর রোদনের ভাষায় ফুটিয়া উঠিতেছে। আধুনিক কাব্য-সাহিত্য গাহিতেছে ঃ

"ছটা নাই ছন্দ নাই, তবু তুলি লইনু তুলিকা
অশ্রু দিয়া লিখে যাই একখানি নিষ্ফল লিপিকা"

এই নিরাশা-পীড়িত সমাজের সাহিত্য নৈসর্গিক রূপের মধ্যেও তাহার দুঃখকে প্রতিপালিত করিয়া বলিতেছে ঃ

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি, অস্তশিখর পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি, মৃত্যুশয়ান, রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন, বৃথা গায়ত্রী গান,
রাত্রি আসিয়া ডেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান,
সেই রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা
আঁধার আচলে নিশার অশ্রু উষার শিশিরমালা।

আর একদিক হইতে রেনেসাঁস যুগের ও অর্থ সংকটকালের সাহিত্য তুলনা করিয়া দেখাইব। একই নৈসর্গিক রূপ কালের ব্যবধানে কবি-চিত্তে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবের আবেদন জাগাইয়াছে। জাগরণের যুগ-সাহিত্যের মধ্যে আশার দীপ্তি ও শান্ত সমাহিত ভাবরস প্রধান, ভাঙ্গনের যুগ-সাহিত্যের মধ্যে ক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য এবং অন্তর্দাহের তীব্রতা প্রবল। সমুদ্রের সৌন্দর্য্য এই দুই কালের কবিচিত্তে যে বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি জাগাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে কবির ভাষণ ঃ

"অতল গম্ভীর তব,
অন্তর হইতে কহো সান্ত্বনার বাক্য অভিনব

আষাঢ়ের জলদ মন্দ্রের মত, স্নিগ্ধ মাতৃপানি
চিন্তা-তপ্ত ভালে তার তালে তালে বারবার হানি,
সর্বাঙ্গে, সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা
বলো তারে, শান্তি শান্তি! বলো তারে ঘুমা ঘুমা ঘুমা।"

মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের কবি কণ্ঠে শুনি ঃ

"সব গেছে আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা উতরোল।
ঊর্ধে শূন্য নিম্নে শূন্য—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।
হে মহান, হে চির বিরহী
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার,
নমস্কার।
নমস্কার লহ !!
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।

আজিকার সাহিত্যের মরণের মধ্যে জীবনকে সমাপ্ত করার অসুস্থ কামনা বাস্তব জীবনের অবসন্নতাকে প্রতিপালিত করিতেছে। প্রাক যুদ্ধকালের সাহিত্যে অকারণ মরণ কামনার ব্যাকুলতা নাই। সে-যুগের সাহিত্যে পাই ঃ

"চাহি না মরণ আমি চন্দ্রমার মত
পক্ষ ধরি, তিলে তিলে ক্ষয়ের যাতনা।
হোক না জীবন দীর্ঘ, হতে পারে যত,
চারি পাশে তারা দল করুক অর্চ্চনা।"

আধুনিক সাহিত্যে মরণাকাঙখা নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে ঃ

"কাফুরের মত ফুরায়ে ফতুর আমি যবে যাবো উবে,
মুচকি হাসিয়া চাঁদ যেন উঠে, রবি যেন উঠে পুবে
নয়নে কাজল দিয়া।
উলু দিয়ো সখী, তব সাথে নয় মৃত্যুর সাথে বিয়া।

তোমাদের তরে ভাই
অক্ষয় থাক এই পৃথিবীর অফুরাণ পরমাই,
আমি যবে যাবো মরে,
ডালিমের ডাল নুয়ে পড়ে যেন নবীন পুষ্প ভরে।"

ইংরাজী সাহিত্যেও ইহার সাদৃশ্য পাই ঃ

"She came in with twilight noiselessly
Fair as rose, immaculate as Truth
She leaned above my wrecked and
wasted youth
And then she kissed my dry hot lips and eyes
Kiss thou, the next kiss, quite Death I pray"

আজিকার অভিজাত শ্রেণীর মানুষ যেন জীবনের কোনখানেই সুস্নিগ্ধ শান্তির আশ্বাস পাইতেছে না অতীত ও ভবিষ্যত কোনদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াই তাহার গৌরবময় পরিণতি সম্বন্ধে ভরসা দেখিতেছে না, তেমনি সাহিত্যও এই নিরাশাকে ফুটাইয়া কহিতেছে ঃ

"অক্ষয় দুর্বল আমি, নিঃসম্বল নীলাম্বর তলে
ভঙ্গুর হৃদয়ে মন বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু
কোন স্বর্ণ রেখাদীপ্ত উষাকালে
আজ তার নাহিক আভাষ।"

কবির কণ্ঠে আজ প্রদীপ্ত উৎসাহের সুরে বাজিতেছে না ঃ

"ভবিষ্যতে মুখোস খানা
খসাবো এক টানে—
দেখাবো তারেই বর্তমানের কালে।"

সমগ্র সমাজ-চিত্তের গতির সহিত সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতিটুকু মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলাম। সাহিত্যের লোকায়ত্ত ব্যাখ্যাকে পরিস্ফুট করিতে হইলে বিভিন্ন যুগ-সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া সমাজের গতি প্রবাহের সহিত ইহার সংযোগ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত আদর্শ হিসাবে যদি কোন সাধারণ

সূত্র রচনা করার প্রয়োজন থাকে, তবে সাহিত্য-সমালোচক Saine-এর ভাষায় বলা যায়—"The artistic family is situated within a larger community, namely the surrounding world whose taste conforms with that of the school."

যে সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে সাহিত্যিক সম্প্রদায় অবস্থিত তাহার ভাবাদর্শের সহিত উচ্চ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সামঞ্জস্য থাকে।

পরিশেষ আর একটি কথায় ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎটুকু দিয়া প্রবন্ধের দাঁড়ি টানিব। জনসাধারণের মত আমার মনেও রস পিপাসার যে আকাঙ্খা আছে, যাহা সাহিত্যকে যাচাই করিয়া, বিচার করিয়া উপভোগ করিতে চায় না, যাহা সাহিত্যের ভাববস্তুকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করিয়া সাহিত্যের আনন্দরসটুকু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ, সেই আকাঙ্খাকে অস্বীকার করিয়া কোন কথা এই প্রবন্ধে বলা হয় নাই। নানা যুগ-সাহিত্যের প্রাণের স্পন্দনে যে মাত্রা-বৈচিত্র্য দেখিতে পাইয়াছি, তাহা যে সমাজচিত্তের গতিচ্ছন্দেরই প্রতিধ্বনি, এইটুকু ব্যক্ত করিতে যাইয়া আমি সাহিত্যের আনন্দ সৃষ্টির দিককে. গভীর রসোপলব্ধির দিককে কোন খানেই অবহেলা করি নাই। প্রবন্ধের বিষয় বহির্ভূত বলিয়া তাহা আলোচিত হয় নাই মাত্র। সাহিত্যের এই আনন্দ সৃষ্টির দিক যাহা জটিল হইতে জটিলতর ভাবাবেদনের দ্বারা মানুষের নিবিড় রসাকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করে, তাহাকে আমি শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইতেছি।

[কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত ঃ মাসিকমোহাম্মদী
ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ১ম ও ২য় সংখ্যা হইতে সংকলিত ১৩৩৯]

পূর্বপাকিস্তানে
বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বাঙলা সাহিত্যসেবীদের মনে পূর্বপাকিস্তানে বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা আর অস্বচ্ছন্দতার ভাব দোলা দিতে শুরু করিয়াছে। এ-আশংকা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন সম্বন্ধে নয়, কারণ উহা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর বহির্ভূত। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষার যে মর্যাদা বাঙলা লাভ করিয়াছিল, তাহা কাড়িয়া লইলেও ইহা

অনস্বীকার্য যে, বাঙলার সাহিত্যিক মর্যাদা আর তার আঞ্চলিক অধিকার ব্যাহত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক সুর সম্বন্ধেও আমাদের আশংকাবোধ করার কারণ নাই। মানুষের অন্তর-নিহিত ভাবধারা, আশা আকাংখা, আদর্শ আর সামাজিক দৃষ্টিভংগীর অভিব্যক্তিকেই যখন ভাষা বলা হয়, তখন মানুষ যখন যে অবস্থা আর পরিবেশের বন্দী হইবে, তখন তাহার ভাষার সুরও তদনুসারে ব্যঞ্জিত হইতে বাধ্য। অবসাদগ্রস্ত, নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের কণ্ঠ হইতে বিজয়দৃপ্ত সেনাবাহিনীর সুর শ্রবণ করার প্রত্যাশা যেমন অনুচিত, আদর্শবঞ্চিত লক্ষ্যহারা, উদ্‌ভ্রান্ত, পরকীয়াবাদী সাহিত্যিকদের কণ্ঠ হইতে বলিষ্ঠ আদর্শ ও সংযত সুরের সঙ্গীতলহরী নিঃসৃত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

আমরা পূর্বপাকিস্তানে বাঙলা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধেই আশংকাবোধ করিতেছি।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলাই উচিত। স্বাধীনতালাভের পর হইতে সকলক্ষেত্রেই যেমন একটা ভাঙ্গা-গড়া সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙলা ভাষাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করার জন্যও একটা টানাটানির ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ভাষার পরিবর্তিত আকার দ্বারা সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত হওয়াও অনিবার্য আর গঠনকামী জাতির পক্ষে ভাষাকে উন্নত আর সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। কিন্তু ভাষার সমৃদ্ধিসাধনের তাৎপর্য কি?

বৈদেশিক সাহিত্যে দর্শনশাস্ত্র, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ফলিতবিজ্ঞান আর পৌরদর্শন ইত্যাদির এরূপ হাজার হাজার পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে, যেগুলির যথোপযুক্ত প্রতিশব্দ-সম্বলিত কোন ইংরাজী বাঙলা অভিধান আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। পূর্বপাকিস্তানের নাগরিকদের বৃহত্তর অংশ মুসলমান হইলেও ইসলামিক ভাবধারা, তমদ্দুন, তহযীব, সিকাফত, আকীদা, ইবাদত ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির সঠিক ও নির্ভুল বাঙলা প্রতিশব্দ এপর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। পূর্ববাঙলায় ইসলামের পদক্ষেপ আর তাহার সামগ্রিক ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থ বাঙলায় নাই। হাদীস তফসীর, ফিকহ্ অসূল আর সাধারণ ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রামান্য বৃহৎ কোন গ্রন্থ বাঙলাভাষায় লিখিত হয় নাই। আধুনিক

দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের যেসকল মহামূল্য পুস্তক পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এমনকি উর্দুতেও লিখিত ও অনূদিত হইয়াছে আর হইতেছে, বাঙলা সাহিত্য সেসকল সম্পদ হইতে আজও বঞ্চিত রহিয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানে বাঙলা সাহিত্যের এই নিঃস্ব অবস্থা পূর্বপাকিস্তানীদিগকে সকল দিক দিয়াই ফতুর করিয়া রাখিয়াছে। মৌলিক উৎস হইতে বঞ্চিত থাকিয়া ওরিয়েন্টালিস্ট বিদ্যাদিগ্‌গজদের মুখে ঝাল খাইয়া আমাদের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকরা মুসলিম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ও তাহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অধিকাংশ সময়ে যে সকল গবেষণার পরিচয় দিয়া থাকেন, তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পক্ষে তাহা রোমাঞ্চকর হইলেও প্রকৃতপক্ষে মনে করুণ রসেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। পূর্ব-বাঙলার কবিতা সাহিত্যে বৈষ্ণব ন্যাড়া ভাবধারার যে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকে 'যবন হরিদাসে'র উত্তরাধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ইসলামী সাহিত্যিকতার সহিত উহার সামঞ্জস্যবিধানের সত্যই কোন উপায় নাই। আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যই এই মতিচ্ছন্নের জন্য দায়ী।

জ্ঞানবিজ্ঞানে পূর্বপাকিস্তানে বাঙলা সাহিত্যের দারিদ্র সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 'দ্বীনিয়াত'কে আরাবী উর্দুর কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার দরুণে যেমন পুরোহিততন্ত্রের মত জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন একটা 'থিউক্রেটিক সোসাইটি' জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি লৌকিক শাস্ত্রগুলি পাশ্চাত্যভাষার লৌহপ্রাচীরের অন্তরালে আটক থাকায় ইনটেলিজিনশিয়ার আর একটি অভিজাত দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানে বাঙলাভাষার রূপ কেমন হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামানো হইতেছে। গোড়াগুড়ি হইতেই এ সম্বন্ধে দুটি চরমদল দেখিতে পাওয়া যায়, একদল ইহাকে সংস্কৃতবহুল আর অন্যদলটি বাঙলাকে আরাবী, ফার্সী শব্দবহুল করার পক্ষপাতি। এই টানাটানির ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষফোড়া বাঙ্‌লাসাহিত্যের সুদর্শন দেহকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা মনে করি, যে দেশের যে ভাষা তাহাতে সে-দেশের সকল অধিবাসীর তুল্য অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু তুল্যাধি-কারের অর্থ যদি এই হয় যে, আসামের ধুবড়ি সীমান্ত হইতে শ্রীহট্ট

ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীদের কথ্যভাষার জন্য বাঙলা সাহিত্যের দ্বার অবারিত করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হযরত নূহের যুগের মত 'আবোল তাবোল ভাষা বিভ্রাট' (تبلبل الســنة) সৃষ্টি হওয়ার আশংকাই আমরা পোষণ করি। সৈয়দে আলাওল চট্টলভূমির সন্তান ছিলেন আর ভারতচন্দ্র ছিলেন বর্ধমান যিলার লোক। নবীন সেন ছিলেন চট্টগ্রামের আর বঙ্কিমচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন যশোরে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মেদিনীপুর বা কলিকাতার আর রজনীকান্ত ছিলেন ঢাকার। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন ২৪ পরগণার, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন হুগ্লীর আর সুরেশ সমাজপতির পৈত্রিক ভূমি ছিল নদীয়া আর রামেন্দ্র ত্রিবেদী ছিলেন মুর্শিদাবাদের। মুযামমিল হক, কায়কোবাদ আর কাযী নজরুল ইসলাম প্রথিতযশা কবি, কিন্তু ইহাদের কেহ পশ্চিমবঙ্গের, কেহ মধ্যবঙ্গের আর কেহ পূর্ববঙ্গের লোক। যেসকল সাহিত্যিক ও কবি জীবন নদীর পরপারে গিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন, আমি কেবল তাঁহাদেরই নাম উল্লেখ করিয়াছি এক নজরুল ইসলাম ছাড়া, আর এরূপ করার কারণ সর্বজনবিদিত। প্রতিভার শ্রেণী বিভাগ অনুসারে সাহিত্যরথীগণের সাহিত্যিক প্রতিভায় বৈষম্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক আর তাঁহাদের সৃষ্টিতে সমাজ, ধর্মবিশ্বাস আর পারিপার্শ্বিকতার ছাপও সুস্পষ্ট। এরূপ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ বরং উচিত, কারণ কবি ও সাহিত্যিকরা সমাজ হইতে পৃথক মানুষ নন।

রাবিন্দ্রিক যুগ হইতে বাঙলা সাহিত্যের ভঙ্গী পার্শ্বপরিবর্তন করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, ভারতচন্দ্র হইতে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বাঙলাভাষাকে আঞ্চলিকতার পরগাছা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তি ও স্থানবিশেষকে কেন্দ্র করিয়াই ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করে, আরাবী সাহিত্য কুরায়েশদের কথ্য ভাষাকে কেন্দ্র করিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য ভাষার প্রভাব আরাবী সাহিত্যে পড়ে নাই, একথা সত্য না হইলেও বহিরাগত শব্দগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া গড়িয়া পিটিয়া এমন নিপুণতার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, উত্তরকালে সেসকল শব্দকে সাধারণ দৃষ্টিতে বহিরাগত বলিয়া চিনিবার উপায় থাকে নাই। উর্দুর প্রভাব পাঞ্জাব আর সীমান্তকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু উর্দুর

কথাশিল্পীরা বাঙালী হউন আর পখ্‌তুনী হউন, সকলকে দিল্লী আর লক্ষ্ণৌর প্রচলিত উর্দু অর্থাৎ গালিব মীর, দাগ আর আযাদকে অনুসরণ করিয়াই চলিতে হইয়াছে। সীমান্ত হইতে বাঙলা দেশ পর্যন্ত সাহিত্যিক আর কবির দল যদি উর্দু সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার অনুপ্রবেশ বৈধ মনে করিতেন, তাহাহইলে উর্দু আজ যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতনা।

পূর্বপাকিস্তানে কথ্যভাষার বিভ্রাট পশ্চিম বাঙ্‌লার চাইতে অনেকগুণ বেশী। যশোর খুলনার ভাষার সঙ্গে শ্রীহট্ট আর চট্টগ্রামের ভাষার প্রভেদ প্রায় বাঙ্‌লা আর ইংরাজীর মতই। এতটা পার্থক্য পশ্চিম বাঙ্‌লার এক স্থানের সহিত অন্যস্থানের কথ্যভাষায় নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর বাঙ্‌লার রংপুরের ভাষার সহিত আসাম-সীমান্তের ভাষার যতটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, পূর্বপাকিস্তানের রাজধানীর খাস বাসিন্দাদের ভাষার সহিত তার শিকিও মিল নাই। ঢাকা সহরের লোকেরা উর্দুর যে পরিমাণ ভক্ত, বাঙ্‌লার প্রতি ততটা অনুরাগী নয়। তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উর্দুকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়, বাংলাকে দেওয়া হয় না।

উর্দুর সঙ্গে আমাদের ঈর্ষা নাই, আমরা উহার ভক্ত আর উন্নতিকামী, কিন্তু বাঙ্‌লা আমাদের মাতৃভাষা আমাদের জন্মভূমির ভাষা, ইহার মাধুর্য আর স্নিগ্ধতা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের প্রত্যেকটি শিরাকে মধুর ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের জয়যাত্রা কামনা করি। লোক সাহিত্যের নামে যেবস্তু বর্তমানে বাঙ্‌লা সাহিত্যে আমদানী করার চেষ্টা চলিতেছে, বাঙ্‌লা ভাষার প্রগতির পথে উহা অন্তরায় হইবে বলিয়া আমরা আশংকা করি। সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভঙ্গিমা অভিন্ন হওয়া উচিত আর তাহা দৃঢ়ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য।

অতঃপর বিচার্যবিষয় হইতেছে, বাঙলাভাষার সে দৃঢ়ভিত্তি কি হইবে? এস্থলে আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিবনা। বাঙ্‌লাভাষা যে পালি, প্রাকৃত ও দ্রাবিড়িয় উপকরণে জন্মলাভ করিয়াছিল, আর সংস্কৃত তাহার প্রধান উপাদান যোগাইয়াছিল, সেকথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। প্রয়োজনের চাহিদা মত পৃথিবীর সব ভাষায় যেমন ঘটিয়াছে, বিবর্তনবাদের বিধান মত আরাবী, ফার্সী, তুর্কী, উর্দু ও ইংরাজীও

সেইরূপ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে একান্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দগতিতে বাঙলা ভাষায় নিজেদের স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। সেমেটিক আর আর্য চিন্তাধারার এই ভাষায় সঙ্গমলাভ হইয়াছে, বৈদান্তিক আর কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গীর বাঙ্‌লা সাহিত্যে মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের নির্মূল করিয়া যাহারা বাঙলাকে শুধু হিন্দুয়ানী ভাবধারার বাহক বানাইতে প্রয়াসী, তাহারা যেরূপ বাঙলায় শত্রু, ঠিক সেইরূপ যাহারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত-জাত শব্দগুলির নির্বাসন ঘটাইয়া শুধু আরাবী ফার্সী দ্বারা বাঙলাকে শুদ্ধি করিতে চান, তাঁহারা যতই ধর্মপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল হউননা কেন, তাঁহারাও বাঙলার বন্ধু নন, তাঁহারা পূর্ববাংলায় একটা অভিনব ভাষা আমদানি করার স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র।

কেহ কেহ বাংলাকে আরাবী বর্ণমালায়, আবার কেহ রোমান বর্ণমালায় রূপান্তরিত করার পক্ষপাতি। বর্ণমালা এক একটি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। বর্ণমালার প্রভাবে ভাষার কাঠামোটাই শুধু নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহার প্রভাব ভাষার মন ও মস্তিষ্ককেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তুর্কী ভাষা রোমান বর্ণমালায় লিখিত হওয়ার পর হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ তুর্কীদের নামের উচ্চারণভঙ্গী লক্ষ্য করিলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বাঙ্‌লার যে বর্ণমালা রহিয়াছে, তাহাই থাকিবে, কেবল কয়েকটি বর্ণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাহাতে আরাবী ফার্সী শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভবপর হয়। পূর্বপাকিস্তানের নবীন লেখকগোষ্ঠী ব্যাকরণ আর বানানের ঝামেলা বোধ হয় আর বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ব্যাকরণ আর বানান ভাষায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, কোন ভাষার সাহিত্যিকদের তাহা গোপন থাকার কথা নয়। এই দুইটিকে যাঁহারা ঝামেলা মনে করেন, সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের বিদায়গ্রহণ করাই কর্তব্য।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিব। পৃথিবীর কোন বস্তুই যেমন উদ্দেশ্যহীন নয়, সাহিত্যও তেমনি কোন উদ্দেশ্যহীন হেঁয়ালি বস্তুর নাম নয়। জাতিগঠনের প্রধানতম উপাদান সাহিত্য। সত্য মিথ্যা কাল্পনিক বাক্য বিন্যাসের নাম সাহিত্য নয়। গল্প, নাটক আর উপন্যাস ইত্যাদির প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করে না, বৈদেশিক

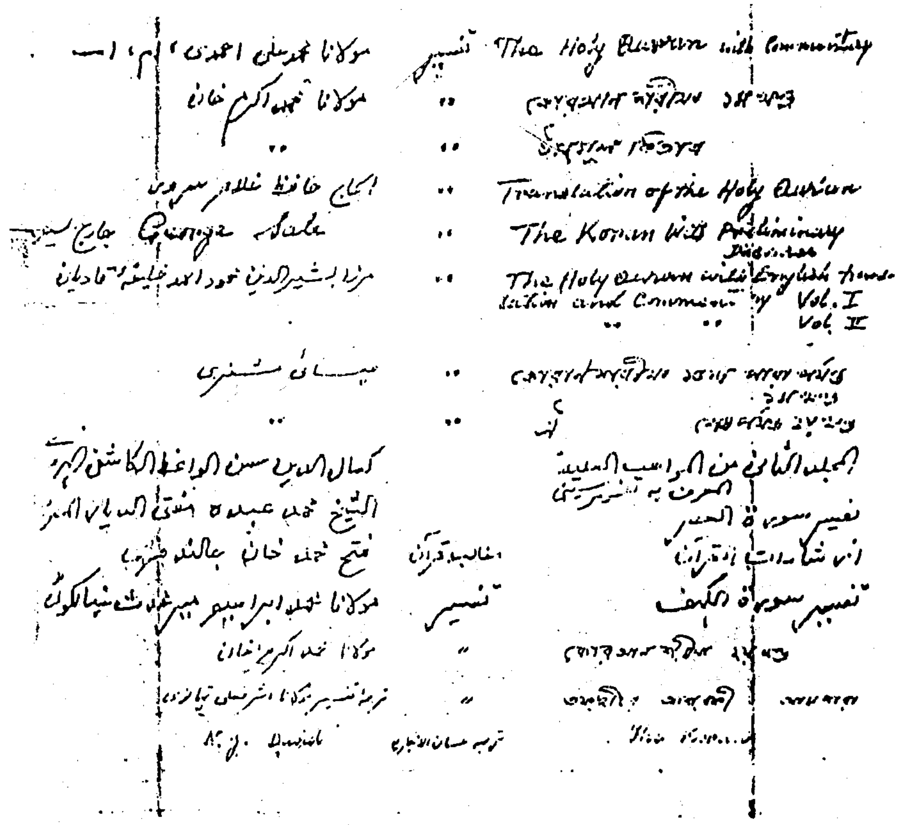
The Holy Quran with Commentary
Translation of the Holy Quran
George Sale
The Koran with Preliminary Discourse
The Holy Quran with English Translation and Commentary Vol. I
Vol. II

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফীর হস্তলিখন। মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফীর এই হস্তলেখাটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

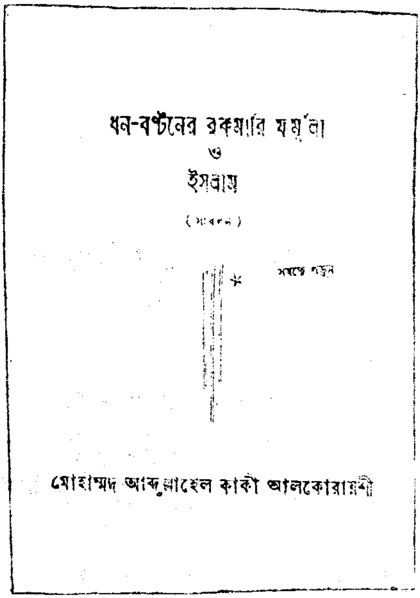

ধন-বণ্টনের রকমারি ফর্মূলা

ও

ইসলাম

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

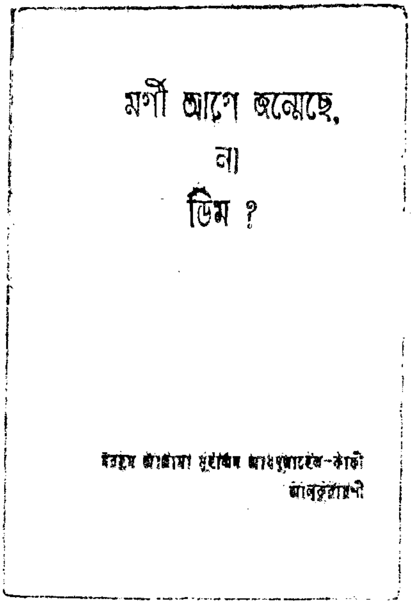

মুর্গী আগে জন্মেছে,

না

ডিম ?

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল-কাফী
আলকুরায়শী

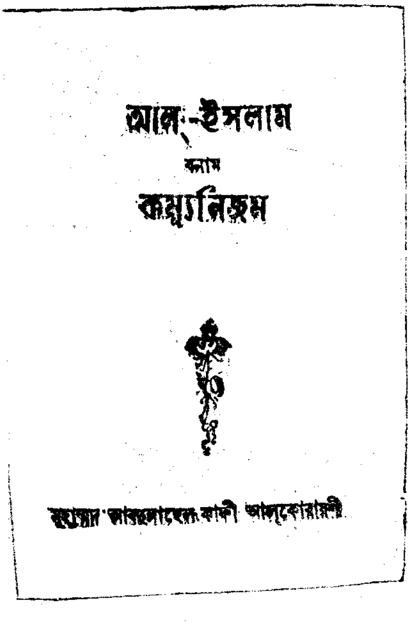

আল্-ইসলাম

বনাম

কম্যুনিজম

মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

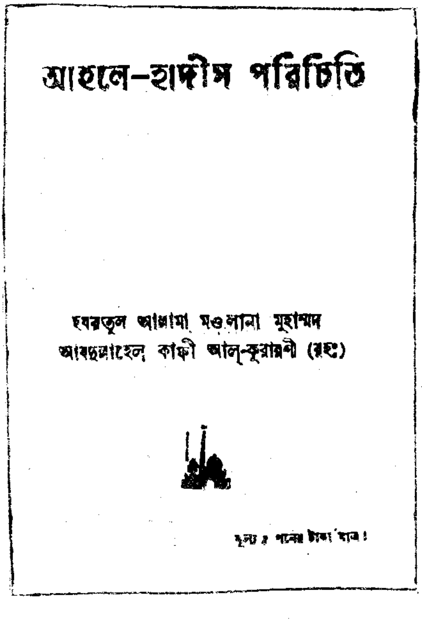

আহলে-হাদীস পরিচিতি

হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ
আবদুল্লাহেল কাফী আল্-কুরায়শী (রহঃ)

মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র।

· আবদুল্লাহেল কাফী সম্পাদিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র

গল্পসাহিত্য দ্বারা কোন কোন দেশে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, সেকথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীং পূর্ব-পাকিস্তানে গল্পসাহিত্যের যে একঘেয়ে ধারা প্রবর্তিত হইতেছে তাহাতে সাহিত্যিক প্রতিভার অভাব প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া উঠে। গীতিকাব্যের অবস্থাও তথৈবচ। পশ্চিম বাঙলার অবস্থা এ বিষয়ে বিশেষ উন্নত না হইলেও তাঁহাদের যে বিরাট সাহিত্যসম্পদ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ নাই। কিন্তু আমাদের বেলায় মনে হয়, স্বাধীনতা-লাভ করার পর আমাদের সমুদয় কর্তব্য যেন নিঃশেষিত হইয়াছে। সৃষ্টি আর গঠনের কোন প্রয়োজনই যেন আর নাই। আর যাঁহারা নূতনত্বের নামে কিছু পরিবেশন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ মাল বস্তাপচা। ইসলামি সংস্কৃতি আর সভ্যতার ইতিহাস নাম দিয়া তাঁহারা বেশীর ভাগ পরের মুখে ঝাল খাইয়া নিজেদের অনভিজ্ঞতার নগ্নচিত্র দেশবাসীকে প্রদর্শন করিতেছেন। যেক্ষেত্রে যাহার অধিকার নাই, সেক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করায় পূর্ববাঙলার সাহিত্য ক্রমশঃ হালকা আর খেলো হইয়া যাইতেছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানি সংস্করণের প্রয়োজন নাই। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিক ও কবিগণ প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতার ট্রেডমার্ক ছাড়াই চিরদিন বাঙলার যেভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যিক ও কবিদেরও সেই পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। বাঙলায় আরাবী, ফার্সী, তুর্কী ও ইংরাজীর আমদানী দোষণীয় না হইলেও প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যবরদস্তিমূলক ভাবে যেন এই আমদানির অভিযান চালান না হয়। ভাষার সম্পদবৃদ্ধি আর বক্তব্যবিষয়কে স্পষ্টতর করিয়া তোলার জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অন্যান্য ভাষায় শব্দগুলিকে বাঙলারই অংশরূপে গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষায় দীক্ষিত করার মনোভাব লইয়া শব্দ-সংযোজনার কার্য চালান হইবেনা। অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সাহিত্য তাহাদের নিজস্ব মনোভাব মতবাদ ও ঐতিহ্যের দর্পণ হইবেই কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য সাহিত্যের ভাবসম্পদ হইতেই উৎসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, শব্দসম্পদ দ্বারা ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় বিধান সঙ্গত হইতে পারেনা।

কিন্তু এপথে একটি প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। বাঙলার সৃষ্টিসাধনে যদিও মুসলমানরাই অগ্রণী ছিলেন আর সুলতানদের দরবারেই বাঙলা তাহার শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা নানারূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়ায় বাঙলাভাষার প্রতিপালন ও পরিপুষ্টির দায়িত্ব অতঃপর সর্বতোভাবে হিন্দুদেরই হস্তগত হইয়া পড়ে আর ইহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ বাঙলার শব্দভাণ্ডারে এরূপ শত শত শব্দ স্থানলাভ করে যেগুলি হিন্দুয়ানী কিম্বদন্তী, প্রতিমাপুজা ও অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শব্দগুলির কতক বাঙলা সাহিত্যের অপরিহার্য অংশে পরিণত হইয়াছে আর কতক শব্দ মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য বর্জনীয়। মুসলমান সাহিত্যিক মণ্ডলীর অনেক মাননীয় ব্যক্তিরাও দুর্ভাগ্যবশতঃ শব্দচয়নে এসম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ফলে মুসলমানের সৃজিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের সাহিত্যসম্পদ হিন্দুয়ানী সাহিত্যেই পরিণত হইয়াছে।

সর্বশেষ গোযারিশ এই যে, কিছুদিন পূর্বে বাঙলা শব্দের বানান সম্পর্কে সাহিত্যিক সমাজে একটা আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত আন্দোলনের কোনরূপ সন্তোষজনক ফল দেখা দেয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে সংশোধিত বানান পদ্ধতি কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহারও পূর্ব্বপাকিস্তানে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়না। বাঙলায় তিনটি দন্ত, তালব্য আর মূর্ধন্য-ষ রহিয়াছে আর রহিয়াছেছ। আরাবীতেও সে, সিন, সোয়াদ আর শিন রহিয়াছে। বাঙলায় বর্গীয় আর অন্তস্থ য রহিয়াছে আর আরাবী ও উর্দুতে রহিয়াছে যাল, যা, যোয়াদ আর জীম। এই বর্ণ-গুলিকে যাহাতে উচ্চারণের সৌসাদৃশ্য মত যথাসম্ভব পরস্পরের স্থলাভি-ষিক্ত করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা কি একেবারেই অসম্ভব? কোন কোন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের নামের বানানের শ্রী দেখিলে সত্যই মাথা ঠুকিতে ইচ্ছা হয়।

বাংলার বর্ণমালা ও উচ্চারণ

বর্ণমালার সংখ্যা কম হলেই ভাষা সর্বাংগ সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে, এ নীতি আমরা স্বীকার করিনা, কারণ ভাষায় স্ফুরণ ও অভি-

ব্যক্তির জন্যই বর্ণমালার প্রয়োজন। জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু, দন্ত, নাসিক্য, ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থান হতে যে সকল শব্দ নির্গত হয় সেগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করার মত অক্ষরের যে ভাষায় অভাব আছে, তাকে মূক বলতে হবে, উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষার বর্ণলিপি বলা চলবে না। আমরা মনে করি যে, ভাষার জন্যই বর্ণমালা আবশ্যক; বর্ণমালার জন্য ভাষা নয়। কিন্তু তাই বলে আমরা অনাবশ্যক সংখ্যাবাহুল্যের পক্ষপাতি নই। যে অক্ষর নিরর্থক, যার পৃথক এবং বিশিষ্ট উচ্চারণ নেই, কেবল বানান বিভ্রাট সৃষ্টি করার জন্য সেরূপ অক্ষরের অস্তিত্ব ভাষার আবর্জনা মাত্র।

সংস্কৃত ভাষায় আমরা পণ্ডিত নই, কিন্তু বাংলাকে মাতৃস্তন্যের সংগেই গ্রহণ করেছি, মায়ের বুকের খীর-ধারার মতই বাংলা আমাদের কাছে সুমধুর। সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণভঙ্গী ঠিক রাখার জন্য বাংলার বর্ণমালা পঞ্চাশের সংখ্যাকেও অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু সংস্কৃতের সে দেববাঞ্ছিত উচ্চারণ বাংলার ধাতে সয়নি তবুও আজ পর্যন্ত আভিজাত্য রক্ষা করার জন্য তার স্মৃতি প্রতিপালিত হচ্ছেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মাছের 'আঁশে' 'মশা'র কোনরূপ আপত্তি না থাকলেও শুধু সংস্কৃতের গৌরবের জন্য মশককে আমিষের বর্ণে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, সরিষার আদি ও অন্তের বর্ণে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নেই, অথচ সর্ষপের আভিজাত্য রক্ষাকল্পে বর্ণভেদ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুদ্রযুগের মহিমায় ব্রাহ্মণত্বের গৌরব সকল স্থানে ঠেকানো সম্ভবপর হয়নি, অমৃতের সন্তান মনুষ্যের অপভ্রংশ হলেও হরতালের ভয়ে মিনসেকে স্বীকার করে নিতে হয়েছেই, সাধের শ্রদ্ধার উপর অরুচি ধরে গেছে। ফলকথা, বাংলার যে শব্দগুলি সংস্কৃতজাত, যতক্ষণ সেগুলির সাংস্কৃতিক উচ্চারণ রক্ষা করা অনিবার্য্য মনে হবেনা, অন্ততঃ ততক্ষণ পর্যন্ত বর্ণবিদ্বেষ ছাড়তেই হবে।

যদি কেউ বলেন, এ বর্ণবিদ্বেষ দিয়ে বাংলার কৌলীন্যমর্যাদা বাড়বে, তার অন্তজ হবার অপবাদ ঘুচবে তার উত্তরে আমরা বলবো যে সংস্কৃতের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে বলেই যদি বাংলা অন্তজ হয়, তাহলে পৃথিবীর কোন ভাষাই কুলীন নয়। দুনয়ায় মানুষের

বংশগত কৌলীন্যের অবসান ঘটছে কিন্তু অভাগিনী বাংলা ভাষা আজো অপাংক্তেয়ই থেকে গেল। আর বাংলাকে নবআভিজাত্যের—গদীতে প্রতিষ্ঠিত করার অতি-আগ্রহে যাঁরা সাংস্কৃতিক উচ্চারণের চিহ্নগুলি নিশ্চিহ্ন করতে সমুৎসুক হয়েছেন, তাঁদের জেনে রাখা দরকার যে, বাংলাকে নিরাভরণা করে বিধবার বেশে সজ্জিতা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু মেয়ের দেহে মায়ের অংগ—অবয়বের যে চাপ আছে, তা দূর করতে চাইলে বাংলাকে ব্যবচ্ছেদাগারে [Dissection Hall] পাঠাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত বাংলার জননী। ভূত, প্রেত নয় যে, ওঝা ডেকে বাংলার ঘাড় থেকে ওকে নামিয়ে দেওয়া যাবে। আর বাংলার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য আজ যদি সাংস্কৃতিক উচ্চারণের অক্ষরগুলিকে বাদ দিতে হয় তা হলে কাল আরাবী, ফার্ছী শব্দগুলির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবেনা কেন? আর এই ভাবে বাংলা হতে সংস্কৃত, আরাবী ফার্ছী সমস্ত ভাষারই প্রভাব দূর করতে হলে বাংলার আভিজাত্যের—পরিণতি হবে কোন আকারের?

মোটকথা, কোন বর্ণের অন্ধ বিদ্বেষ আর কোনটার প্রতি অহেতুকী ভকতি বর্ণমালা সংশোধনের নীতি হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনের আলো হাতে করেই এ পথে অগ্রসর হতে হবে।

প্রথমেই জেনে রাখা উচিত যে বাংলা বলতে আমরা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালী, আরাবী, ফার্ছী, উরদু ও ইংরেজী প্রভৃতি শব্দের মিশ্রিত ভাষাকে বুঝবো। যে ভাষার যে শব্দ, তার উচচারণ রক্ষা করার জন্য কোন্ অক্ষর বাদ দেওয়া বা রাখা অথবা বৃদ্ধি করা আবশ্যক আগে তাই পরীক্ষা করতে হবে।

(ক) কথা উঠেছে—বাংলায় অন্তস্থ য-এর উচচারণ নেই, সুতরাং ওকে বাদ দিয়ে শুধু বর্গীয় জ বলবৎ রাখা হোক। অন্তস্থ য এর সঠিক উচ্চারণ সাংস্কৃতিক বাংলার কোন শব্দের জন্য আবশ্যক কিনা, তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে, সাংস্কৃতিক বাংলার কোন শব্দেই ওর উচ্চারণ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় না। যজন, যজ্ঞ, যক্ষ্মা, যদি, যন্তা, যন্ত্র, যশ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় জজন, জক্ষা, জদি, জন্তা, জন্ত্র, জশ ইত্যাদির উচ্চারণেই বলা হয়। এ অবস্থায়

এরূপ সাংস্কৃতিক-বাংলা শব্দগুলি অন্তস্থ যএর পরিবর্তে বর্গীয় জ দিয়ে লিখলে অসুবিধার কারণ হবে না, অবশ্য নূতন শব্দকোষ তৈরী করা আবশ্যক হবে। কিন্তু আরাবী ফার্ছীর ذ ز ض ظ আর ইংরেজীর Z এর উচ্চারণ যে সকল বাংলা শব্দে প্রয়োজনীয় হবে, তাদের জন্য একটী অক্ষর আবশ্যক; আর আমাদের বিবেচনায় অন্তস্থ য সে অভাব পূরণ করতে পারবে। যেমন, জাহায, ওযু, যালিম, যিরো যোন ইত্যাদি।

যারা উল্লিখিত অক্ষরসমূহের উচ্চারণের জন্য বর্গীয় জ কেই যথেষ্ট মনে করেন, তাঁদের যুক্তির সারবত্তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। অধিকন্তু উপরিউক্ত অক্ষর সমূহের প্রত্যেকটীর উচ্চারণ ভেদ বজায় রাখার জন্য যাঁরা পৃথক পৃথক বর্ণ বাংলায় আমদানী করার পক্ষপাতি, আমরা তাঁদের সংগেও একমত নই, কারণ ঐগুলির উচ্চা-রণের পারস্পরিক বৈষম্য এতই সূক্ষ্ম ও চুলচেরা যে, তাকে সংস্কৃতের তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষএর সংগে অনায়াসে তুলনা করা চলতে পারে। বর্ণিত আরাবী, ফার্ছী অক্ষরগুলির উচ্চারণ ভেদ বাংলায় রক্ষা করতে না পারলে আরাবী ফার্ছীর জাতিচ্যুতির আশংকা নেই আর জাতিরক্ষার এ আব্দার রক্ষা করতে গেলে সে বোঝায় বাংলা বর্ণমালার ঘাড় ভেংগে চুরমার হবে। পক্ষান্তরে আরাবী, ফার্ছী ও ইংরেজী ভাষায় যাদের অল্পবিস্তর জ্ঞান রয়েছে, তাদের পক্ষে উল্লিখিত বর্ণের অনু-লেখন কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়। যবহকে কোন ব্যক্তি ضبح, জাহাযকে جهاظ, ওযুকে وذو যালিমকে, زالم, যিরোকে gero আর যোনকে Jone লিখতে পারে না।

(খ) মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন এর পার্থক্য আর উচ্চারণ ভেদ সংস্কৃতে থাকলেও বাংলায় ওর সার্থকতা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর, অবশ্য এর ফলে বাংলায় যে বানান বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে তা কারো অজানা নেই। সংস্কৃত ছাড়া দুনয়ার কোন ভাষায় দুটী নকার আছে কিনা সন্দেহ। সাংস্কৃতিক উচ্চারণের গুরুতর অমর্যাদা না ঘটলে এ বিভ্রাটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। আমাদের ধারণায় আরাবী যওয়াদ ও যোওয়ার মধ্যে যতটুকু উচ্চারণ ভেদ রয়েছে সংস্কৃতের মূর্ধন্য ণ ও দন্ত ন এ তার চাইতে বেশী পার্থক্য নেই, সুতরাং যওয়াদ ও যোওয়ার

বেলায় আরাবী কৌলীন্য যতটুকু খর্ব হচ্ছে, মূর্ধন্য ণ ও দন্ত ন এর বেলায় সংস্কৃতেরও ততটুকু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

(গ) বর্গীয় ও অন্তস্থ ব এর উচ্চারণভেদও অত্যন্ত আভিজাতিক। শূদ্র বা প্রোলেটেরিয়ট যুগের বহুপূর্বেই এ বৈদিক আভিজাত্যকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ এর উচ্চারণভেদও যওয়া'দ ও যোওয়ার ন্যায় অতি আভিজাতিক। বিগত কয়েক শতকে এ কৌলীন্য বাংলায় রক্ষা করে চলা সম্ভবপর হয়নি। ষড়্‌দর্শনে শীতের প্রকোপ কি এক টুকুও অস্বীকৃত হয়েছে? শিব ঠাকুর কি ষাঁড়ের বাহন প্রত্যাখান করতে পেরেছেন? বর্ষীয়সী শুকতারার হর্ষ কি কিছু নিষ্প্রভ হয়েছে? যার বাস্তবতা নেই, তার লাশ বয়ে বেড়ালে কি লাভ হবে? এতএব দুই শ এর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া উচিত। গোড়াতেই যখন তালব্যশকে পাওয়া গেল তখন মধ্যে গিয়ে কি লাভ হবে?

(ঙ) কিন্তু দন্ত স-কে বাদ দেওয়া চলতে পারে না। ইংরেজী S এর উচ্চারণে বাংলায় স্ত্রীজাতির স্নেহ রয়েছে, এর তুলনা করার স্পর্দ্ধা আরবেরও নেই, ইউরোপেরও নেই! মায়ের স্মৃতি জাগ্রত হলে আজও কি অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ হয়না? আর বাংলার আস্তিক হোক আর নাস্তিক স্নানে কারুরই অরুচি নেই আর স্রষ্টার প্রতি আস্থাকে একদম আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার জন্য কেউ ব্যস্ত নন। কাজেই আস্তে আস্তে দন্ত স-কে চিরবিদায় দেওয়ার স্পৃহা আমাদের নেই। অবশ্য S এর উচ্চারণ বাংলায় শুধু দন্ত স এ সীমাবদ্ধ না রাখায় দন্তসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে এবং শ্রাবণের অশ্রুধারার দায়িত্ব তালব্য শ এর ঘাড়ে ন্যস্ত করায় দন্ত স শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আবার একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলার অধিকাংশ শব্দে দন্তসকে জাতিচ্যুত করে এক বিশ্রী ও অশ্লীল পরিস্থিতির উদ্‌ভব ঘটান হয়েছে, কিন্তু সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইংরেজী S এর উচ্চারণের জন্য বাংলায় একটি বর্ণের আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারা যাবেনা আর এর জন্য দন্তসকেই বহাল রাখা উচিত।

যাঁরা বলেন ইংরেজী S এর উচ্চারণ বাংলার ছ দিয়ে সম্পন্ন হবে, তাঁরা ছ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণের কি গতি করতে চান? ছলনা

করে ছবি,—ছাগল, ছুত, ছাপা, ছেঁড়া, ছুটি ও ছেলে প্রভৃতি শব্দগুলির ছ কে ইংরেজী S বর্ণের ন্যায় উচ্চারণ করতে বললে ছাত্র মহল হাস্য সম্বরণ করতে পারবে তো? আমরা এটাকে বাংলার অপমান মনে করি। উরদু বা হিন্দীর ছোটা, ছিঁটা, ছত, ছক্কা ও ছটাক কে S এর ন্যায় উচ্চারণ করতে বললে পাকিস্তানের ছেলেরা ছুরী নাহোক ছড়ী বের করবেই। সুতরাং বাংলা, উরদু ও হিন্দীর ছ কে যেমন এস উচ্চারণ করলে চলবেনা, তেমনি ছ বর্ণের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে এস এর উচ্চারণের জন্য দন্তসকে বাঁচাতে হবে।

(চ) এখানে আর এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আরাবী, ফার্ছী, উরদু ভাষায় তিনটি বর্ণ আছে। যথা, ث, س, ص, এদের উচ্চারণের পারস্পরিক ভেদও অতি আভিজাতিক। যওয়াদের পরিবর্তে যেমন কেউ কেউ ধ উচ্চারণ করতে চান, তেমনি কেউ কেউ—ث র জন্য থ, س এর জন্য দন্তস আর ص এর জন্য ছ প্রয়োগ করার উপদেশ দেন. কিন্তু আরাবী উচ্চারণভঙ্গীর এই সূক্ষ্ম ভেদাভেদ যা ফার্ছী ও উরদুতেও রক্ষিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি, বাংলার ভিতর চালু করার প্রচেষ্টা রুচিবিকারের পরিচায়ক। ওগুলির পার্থক্য আরাবী কির-আতের জন্য সুরক্ষিত রাখাই নিরাপদ, কিন্তু উল্লিখিত বর্ণত্রয়ের উচ্চারণ বাঙলার কোন্ বর্ণ দিয়ে রক্ষিত হবে? আমাদের মত হচ্ছে যে, দন্ত স কে তালব্য শ ও মূর্ধন্য ষ এর অনধিকার চর্চা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভবপর হলে দন্তস এর মধ্যেই এ অভাব পূরণ করার সর্বাধিক যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু মুশকিল এইযে, বাংলার শ্রী শ্রাবণ, আশ্রয় আর সরিষা, সরু ও সর্প প্রভৃতি শত শত শব্দের মধ্যে যে উচ্চারণ বিনিময় ঘটেছে, তা ফিরোবার উপায় কি? আরাবী ও ফার্ছী বর্ণমালায় বাংলা ছএর প্রকৃত উচ্চারণের সংগে সংগতি রক্ষা করে চলার মত কোন বর্ণ নেই। অর্থাৎ আরাবী ছবর, ছাহেব ও ছুবুৎ আর ফার্ছীর ছরদার ইত্যাদিকে, যাদের আরবী ফার্ছীর বর্ণজ্ঞান আছে, তারা ছাগল ও ছেঁড়ার উচ্চারণে কোনদিন পাঠ করবেনা, কিন্তু যাদের সে বর্ণজ্ঞানটুকুও নেই, তারা কি করবে, তাও ভাবা উচিত। ভেবে চিনতে দেখতে পাচ্ছি যে, সাংস্কৃতিক দন্তস এর পাঠকরা দু শতাব্দী যাবৎ মশক করেও আজ পর্যন্ত মুসলমানকে মুশলমান উচ্চারণ

করে চলেছেন। আর ছ কে ছে, ছীন ও ছওয়াদের উচ্চারণে পাঠকরা বাংলাতেও একেবারে অভিনব নয়, যাঁরা 'তছরুফ' (তছর্‌রুফ) কে ইংরেজী S আর আরবী س এর উচ্চারণে পাঠ করা 'পছন্দ' করে থাকেন তাঁদেরকে কেহই ছি ছি করেন না। সবদিক বিবেচনা করার পর আমরা ث-س ও ص এর উচ্চারণের জন্য বাংলার ছ বর্ণকে মনোনীত করাই শ্রেয় মনে করি, কিন্তু এ মনোনয়ন শুধু উপরিউক্ত বর্ণত্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে চাই।

(ছ) যুক্ত ক্ষ প্রকৃতপক্ষে ক এর সংগে মূর্ধণ্য ষ এর যুক্ত উচ্চারণ প্রকাশ করার অক্ষর, যেমন ভিকষা, রকষা। বাংলায় এরূপ স্বতন্ত্র কোন উচ্চারণ নেই। অতএব খ কে যুক্তভাবে লিখতে হলে দুটি খ লেখাই সমীচীন।

(জ) আরাবী বর্ণমালার পাঁচটী অক্ষর—ح خ ع غ ق-এর সঠিক উচ্চারণও বাংলা বর্ণমালায় নেই। অনন্যোপায় 'হালতে' 'খালী' 'আদ-তে'র উপর নির্ভর করে 'গলতী'কেই 'কবুল' করা হচ্ছে। কেউ কেউ গঈন কে ঘঈন লেখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমাদের বিবেচনায় خ ও غ সম্বন্ধে বেশী ব্যস্ত হবার কারণ নেই; কারণ বাংলা খ আর গ বর্ণের উচ্চারণ যেমন আরাবী বর্ণমালায় নেই, তেমনি আরাবী خ আর غ এর উচ্চারণও বাংলা বর্ণমালায় নেই, প্রত্যেক পক্ষের অক্ষর দুটির অপর পক্ষের সঙ্গে বিনিময় ঘটালে কোনরূপ সংঘাত বা বহিরাক্রমণের আশংকা থাকবেনা। সুতরাং বাংলা অনুলেখনে خ কে খ আর غ কে গ লিখতেই হবে; আরাবী উচ্চারণেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না।

হায়ে-হুততী, অঈন ও কাফ করশত সম্বন্ধে কি করা যাবে? হায়ে হুততীর অভাব এ যাবৎ বাংলার হ দিয়েই মেটান হচ্ছে, কিন্তু হ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ হচ্ছে হায়ে হাউয়ায। যদি এ পার্থক্য যওয়াদ ও যোওয়া কিংবা ছীন ও ছওয়াদের মত হতো, তা হলে একা হ দিয়েই হুততী ও হাউয়াযের অভাব পুরণ করা যেত, কিন্তু এতদুভয়ের উচ্চারণ-ভেদ একটু গুরুতর রকমের, অর্থ বিভ্রাটও ভয়ংকর। বাংলায় রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নাম আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ রূপে লেখার ব্যবস্থা না হওয়া শুধু লজ্জাকরই নয়, জাতীয় কলংকও বটে। মোহাম্মদ আর মুহম্মদ উচ্চারণ নিয়ে ভাষাবিদরা তর্ক চালাচ্ছেন কিন্তু 'হামদে'র হায়ে হুততী

আর হায়ে হাউয়াযের আর্থিক ব্যবধান যে কতটা মারাত্মক, তা তলিয়ে দেখার সুযোগ কাহারো ঘটেনি। হায়ে হুততীর 'হমদ'এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসা, সুতরাং যিনি প্রশংসিত, তিনি হলেন মোহাম্মদ। আর হায়ে হাউয়ায দিয়ে যে 'হমদ' হয়, তা কুরআনে বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে—وترى الارض هامدة এখানে 'হামেদ'এর অর্থ হলো তৃণ-লতাদি শূন্যভূমি barron land. এই রূপে আমরা হায়ে হুত্তীর হাজীকে স্বচ্ছন্দে হাউয়াযের হ দিয়ে লিখে আসছি আর তাতে অর্থ দাঁড়াচ্ছে কুৎসা বা বিদ্রূপকারী। এ-অন্য অর্থ হাজী ছাহেবের জানা থাকলে তিনি অনর্থ সৃষ্টি না করে ছাড়তেন না।

অঈন যমমা যুক্ত হলে উ, কছরা যুক্ত হলে ই আর ফতহা যুক্ত হলে অ বা আ লেখাই বিধেয় মনে হয়, কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে বর্ণ রূপে অঈনের বিলুপ্তি ঘটে আর আলিফের মত স্বরবর্ণে পর্য্যবসিত হয়, বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণও লোপ পেয়ে যায়। উচ্চারণ, বানান আর অর্থ সব দিক দিয়েই এ রীতি অবৈজ্ঞানিক ও অন্যায়। অর্থ বৈষম্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অনেক মুছলমানের নাম 'আবদ' দিয়ে শুরু করা হয়, অঈনের বানানে ইহার অর্থ ছিল দাস, কিন্তু যে ভাবে লেখা হয়ে থাকে, তাতে অর্থ দাঁড়ায় অনন্ত। অঈনের "আরযে'র অর্থ হচ্ছে—পেশ করা করা কিন্তু আকারের দরুণ অর্থ হবে মাটি। অঈনের "ইরাক" দেশের নাম কিন্তু হ্রস্বইকারের বদওলতে অর্থ হলো পিলুর বন। অঈনের "আরব" সুপ্রসিদ্ধ দেশ কিন্তু আকারের জন্য হলো ১ শত কোটি। অঈনের "আদমে"র অর্থ ছিল নিশচিহ্ন কিন্তু আকারের গুণে হয়ে গেল মানবের আদি পিতা। অঈনের জন্য "আছল" ছিল মধু, কিন্তু বর্তমান বানানে হলো ঘাঁটি। অঈনের "আছর" ছিল যুগ বা নামাযের সময়, কিন্তু আকার বৈগুণ্যে হয়ে গেল চিহ্ন। আর কত বলব? এ অন্যায় আচরণের "আক্কেল সেলামী" কত দিন চলবে?

কাফ করশৎকে ক দিয়ে অর্থাৎ কাফ কলেমান এর সাহায্যে অনুলেখনের ফলও সমান ভাবে—অবৈজ্ঞানিক ও অন্যায়, অর্থ বিপর্যয়ের হেতু।—কোরআনকে শরীফ বলে গৌরবান্বিত করতে চাইলেও তার নামে যে বেতমীযী চালান হচ্ছে, তার কফ-ফারা কি? একে যুক্ত ক

দিয়ে লেখার পরামর্শও সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, কারণ প্রথমতঃ ভাষা ও মুদ্রণের উৎকর্ষতার জন্য সাধ্যপক্ষে যুক্তাক্ষর কম হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ পক্ক, মক্কা, সিক্কা, ধাক্কা, ইক্কা, টেক্কা প্রভৃতি শব্দগুলিকে কাফ করশতের উচ্চারণে পড়া হাস্যকর হবে। আর যুক্তাক্ষরের নিয়ম বাতিল করে পৃথক পৃথক ভাবে লেখার ব্যবস্থা প্রযুক্ত হলে কাফ করশতের যুক্তাক্ষরের বেলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান যাবে কি করে?

আমাদের বিবেচনায় বাংলা বর্ণমালায় হায়ে হুততী, অঈন ও কাফ করশৎ—এ তিনটী অক্ষরের অনুলেখনের জন্য তিনটি বর্ণ অবিলম্বে সৃষ্টি করা কর্তব্য।

(ঝ) ত কে হসন্ত দিয়ে ব্যবহার করলে খণ্ড ৎ এর প্রয়োজন থাকবেনা আর এতে একটা বর্ণ কমেও যাবে, অবশ্য এর ফলে হসন্তের প্রাচুর্য্য ঘটবে।

(ঞ) অনুস্বর দিয়ে ঙ কে আর ন দিয়ে ঞ কে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এটা সফল হলে বাঙ্গলাকে বাংলা, রঙ্গপুরকে রংপুর, শঙ্খকে শংখ, অঙ্ককে অংক, ভাঙনকে ভাংগন লেখা চলবে আর তাতে সুবিধা ছাড়া, অসুবিধা হবেনা, কিন্তু জ্ঞান, অনুজ্ঞা, জ্ঞাত, জ্ঞাপন, জ্ঞাতি, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, যজ্ঞ, যাঞ্চা, প্রভৃতি শব্দের সঠিক উচচারণ ঙ— বা ন দিয়ে বজায় থাকবে কি? বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার আগ্রহের ফলে বাংলার অনুনাসিক উচচারণ মাধুর্য্য যা-তে লোপ না পায়, তার দিকে নযর রাখা উচিত।

(ট) কেউ কেউ বলেন, বাংলায় চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন নেই। একথা সত্য নয়। আমি বলবো বাংলা উচ্চারণের যে তিনটী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ তার অন্যতম। হাঁককে হানক, চাঁদকে চানদ, ফাঁদকে ফানদ, আঁধারকে আনধার, আঁখিকে আনখী, মটর-শুঁটিকে শুনটি, হাঁসকে হানস, শাঁখকে শানখ উচ্চারণ করা চলবে বটে কিন্তু সে উচ্চারণ বাংলার হবেনা।

(ঠ) দীর্ঘরী, হ্রস্বলি ও দীর্ঘলীর প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে, এখন হ্রস্বরিকেও বাদ দেওয়ার কথা চলছে—রফলায় হ্রস্বই বা দীর্ঘই দিয়ে কাজ চলবে বলে। হ্রস্বরির স্বতন্ত্র উচ্চারণে যথা ঋক, ঋজু, ঋণ, ঋতু, ও ঋষির বেলায় এ নিয়ম স্বচ্ছন্দে চালানো যেতে পারে,

কিন্তু রির যুক্ত উচ্চারণে যথা খৃষ্টকে খ্রীষ্ট, স্মৃতিকে স্ম্রীতি, মৃতকে ম্রীত, পৃথিবী কে প্রীথিবী বানান করায় হাংগামা বাড়বে বৈ কমবেনা।

(ড) হ্রস্বইর দীর্ঘ উচ্চারণ যেমন দীর্ঘঈ, হ্রস্বউর দীর্ঘ উচ্চারণ যেমন দীর্ঘউ, তেমনি ওকারের দীর্ঘ উচ্চারণ ঔ। ওর সংগে হ্রস্বই যোগ দিলে ওই হয়তো মানাবে আর তাতে ঐ এর কাজও উদ্ধার হবে. কিন্তু ওর সংগে হ্রস্বউ যোগদিলে ঔএর উচচারণ ঠিক থাকবে না। পৌরজনকে পউর জন, সৌষ্টবকে সউষ্টব, সৌরভকে সউরভ পৌষকে পউষ আদৌকে আদউ বলার যৌকতিকতা যউক্তি মাত্র।

* * *

এখন আরাবী ই'রাবের উচ্চারণ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা যাক। আমরা সংস্কৃতের ন্যায়—আরাবী, ফার্ছী উচ্চারণকে বাংলায় রক্ষা করার পক্ষপাতি, কিন্তু আমরা বাড়াবাড়ির সমর্থক নই আর কোন অবস্থাতেই বাংলার উচ্চারণ সৌন্দর্যকে বিপন্ন হতে দিতে রাজী নই। বাংলা অনুলেখনে—ইংরেজীর উচ্চারণ রক্ষা করা যতটা সম্ভবপর, সংস্কৃত, আরাবী ও ফার্ছী শব্দগুলিও ততটা সুবিধা লাভ করবে, বরং সংস্কৃতের দাবী বাংলার উপর বেশী. কারণ বাংলা মায়ের জননী সংস্কৃত, অন্য ভাষাগুলি খালা ও ফুফুর ন্যায়।* বাংলাকে যাঁরা উরদুর পালিতা কন্যায় পরিণত করার পক্ষপাতি. আমরা তাঁদেরকে বাংলা মায়ের সপত্নী পুত্র মনে করি আর এই জন্য বাংলাকে উরদু বর্ণমালায় লেখার

* ভাষাবিদরা বাংলাকে প্রাকৃত ভাষা হতে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু প্রাকৃত ভাষাও মূলতঃ সংস্কৃত হতেই উৎপত্তি লাভ করেছে। মূল সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষাভাষীগণের এ দেশে আগমন করার পর প্রাকৃতিক অবস্থানের দরুণে আর প্রাচীন অধিবাসীবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষ ও মিলনের ফলে প্রাচীন মূল সংস্কৃত ভাষা যে আকার পরিগ্রহ করে তার নাম প্রাকৃত। পাণিনি প্রভৃতি প্রাকৃতের প্রভাব হতে মূল বৈদিক ভাষাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টায় বৈদিক ভাষা সংস্কৃত নাম ধারণ করেছিল। প্রাকৃতের অপভ্রংশ হতেই প্রথমে বাংলা ভাষা স্বষ্টি হয়েছিল, পরে আরাবী ফার্ছী. পালী, হিন্দী, প্রভৃতি ভাষার শব্দগুলি বাংলাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। অতএব বাংলা মূলতঃ যে সংস্কৃতেরই কন্যা, তাতে সন্দেহ করার কিছুই নেই। (লেখক)

আন্দোলনকে আদৌ শ্রদ্ধা করি না। মোটের উপর—বর্ণমালার সংশোধন এবং সংস্কারকে শুধু ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিচার করতে হবে, গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবেনা।

(চ) আরাবীতে স্বরবর্ণ মাত্র তিনটি।—আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া। হ্রস্ব উচ্চারণে এগুলি যথাক্রমে ফত্হা (যবর), যম্মা (পেশ) ও কছরা (যের) বলে কথিত হয়ে থাকে। হ্রস্ব আলিফ বা যবরের স্থলে অকার, দীর্ঘ আলিফ (মম্দুদার) স্থলে আকার, হ্রস্ব পেশের পরিবর্তে হ্রস্বউ, দীর্ঘ পেশ বা ওয়াও এর স্থানে দীর্ঘউ, হ্রস্ব যেরের জায়গায় হ্রস্বই এবং দীর্ঘ যের বা ইয়ার স্থলে দীর্ঘঈ প্রয়োগ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ থাকা উচিত নয়। কিন্তু আরাবীর اب - ابو - عرب - عجم - عبد কে অব অবু অরব অজম অব্দ আর ফার্ছীর اتابک ও امدنی কে অতাবিক ও আমদনী লেখা চলবে কি? —হিন্দী বা সংস্কৃতে অকারের উচ্চারণ ফত্হার মত শোনালেও বাংলার নিজস্বতার দরুণ অকারের সে হিন্দী বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে অকার আর ওকারের মাঝামাঝি ভঙ্গী পরিগ্রহ করেছে। বাংলার প্রতিকূল "অব" "হওয়া" অর্ধ আকারের 'কা-খা'র অনুসরণ করে কোন দিন অনুকূল আব হাওয়া সৃষ্টি করতে পারবেনা। সুতরাং ফত্হা যুক্ত আদ্যাক্ষর সমূহে বিশেষতঃ আলিফ ও অঈনের বেলায় আকার প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নতুবা "আল্হামদু"কে "অল্হমদু" পড়া হবেই।

(ণ) যতদিন অইনের স্থলে কোন বর্ণ প্রচলিত না হচ্ছে, তত দিন অঈন ছাকিন ও হম্যা ছাকিনকে হসন্ত যুক্ত-অ্ দিয়ে লিখে যেতে হবে, যেমন ساع কে ছাঅ بهاء কে বহাঅ, شفاء কে শিফাঅ اعلام কে ইঅ্লাম লিখতে হবে। আলিফ ও অঈন ইয়ার সঙ্গে কছ্রা যুক্ত হলে শুধু ঈকার যথেষ্ট হতে পারে, যেমন—ایمان ঈমান, عید ঈদ। ইয়া ও আলিফের জন্য হ্রস্ব ইকার বা ঈকারে আকার প্রয়োগ করা শুধু অবৈজ্ঞানিকই হবে না, উচ্চারণ করাও অসম্ভব হবে। কারণ এ রূপ ক্ষেত্রে ইয়া স্বরবর্ণের পরিবর্তে ব্যঞ্জনবর্ণ হয়ে পড়ছে। আমাদের বিবেচনায় ব্যঞ্জনবর্ণের ইয়ার জন্য অন্তস্থয় প্রয়োগ করা বিধেয়, সুতরাং ইয়া ও আলিফের যুক্ত লিখন য়া হওয়া উচিত। আবার হওয়া, খাওয়া ও শোয়ার রীতি অনুসারে ওয়াও ও আলিফের যুক্ত উচ্চারণের জন্য

'ওয়া' লেখা কর্তব্য? ওয়াও আর ইয়ার কছরা যুক্ত উচ্চারণ কিভাবে বাংলায় প্রকাশ করা যাবে? অনেকে 'ওয়ে' লিখে থাকেন, কেহ ভে বা ভি বলতে চান, এ দুয়ের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এর পৃথক-উচ্চারণ অন্তস্থ ব এ একার ছিল, কিন্তু অন্তস্থ ব আগেই বাংলার দফতর থেকে পদচ্যুত হয়েছে।—সুখের বিষয় এরূপ শব্দের সংখ্যা আরাবীতেও কম আর বাংলায় এ উচ্চারণের আরাবী শব্দ ছয়টীর—বেশী প্রচলিত নেই, যেমন—ولادت - ولایت - وراثت - وفاق - وجاهت - وداع - এগুলির মধ্যে শেষের দুটী শব্দ একারন্ত মোটেই নয়, যবরদস্তি করিয়া ও রূপ পড়া হয়। গোড়ার দিককার দুটী শব্দকে এ যাবৎ বেলাদৎ, বেলায়ৎ লেখা হচ্ছে, যদি এ বানান ভুল না হয়, তাহলে উপরিউক্ত শব্দগুলিকে সামান্য পরিবর্তন সহকারে বিলাদৎ, বিলায়ত, বিরাছত, বিফাক লেখা যেতে পারে। ওয়াওএর ফত্‌হা যুক্ত উচ্চারণ শুধু ও বর্ণের সাহায্যেই লিখিত হওয়া উচিত, যেমন ওলী, মওত, শওক, মওলবী, লওহ, আওজ, মওজ, তওবা ইত্যাদি। ওয়াও-কে ভ লেখার মধ্যে কোনই যুক্তি নেই।

আর একটা কথা বলেই এ নিবন্ধের সমাপ্তি করবো। সকলের মনে রাখা উচিত যে, খামখেয়ালী, তাড়াহুড়া আর অঙ্গনের আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীর-কোন ভাষা গরিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হতে পারে নি। ভাষাকে তার স্বচ্ছল গতিতে ছেড়ে দিতে হবে কেবল তার গতিস্রোতের বাধা-বিঘ্নগুলিকে দূরীভূত করার জন্য সাধনা করে যেতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি ভাষার সেবা ও সহায়তার জন্য যদি যত্নবান হয়, তা হলে সেটাকে সৌভাগ্য মনে করতে হবে, কিন্তু ভাষাকে রাষ্ট্রশক্তির সেবাদাসীতে পরিণত করার অপচেষ্টা তার অপমৃত্যুর কারণ ঘটাবে। সংস্কার ও সংশোধনের কাজে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়পদে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। **চিরন্‌জিব মাতৃভাষা বাংলা।**

মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম?

বন্ধুবর ডক্টর নছীম যেমন স্বাধীনচেতা তেমনি অত্যন্ত যুক্তিবাদী। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যা প্রমাণিত নয়, প্রাণ গেলেও তা সে কিছুতেই

মানবে না। তর্ক বিতর্কে সিদ্ধহস্ত খুব, ভাষাও ক্ষুরের ধারের মত তীক্ষ্ণ, যত অপ্রিয়ই হোক নিজের মত খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করতে ওর জুড়ি নেই। এক দিন আমার কাছে এসে উচ্চ কন্‌ঠে বললো,—

তুমি যাই বলো মওলানা, বেলআমের গর্দভী কথা বলেছিল, তওরাতের এ উক্তি আমি বিশ্বাস করি না একটুকুও।

আমি তখন কোরআনের একটী আয়ৎ নিয়ে চিন্তা করছিলুম। বন্ধুর চিরাচরিত অনধিকার চর্চায় অভ্যস্ত থাকলেও তখন একটু বিরক্তি বোধ হলো, ওর দিকে না তাকিয়েই বলে ফেললুম,

দুনয়ার সমস্ত গাধার মুখগুলো যদি কেউ—ছেলাই করে দেয় আর ওদের কর্কশ স্বর যদি শুন্‌তে না পাওয়া যায়, তাতে আমি নারায হবো না—একটুকুও।

বন্ধুবর আমার উত্তরটাকে উপহাস মনে করে আমার পাশে স্থানাভাব দেখে দূরে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো আর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলতে লাগলো, "এইটাই তো তোমার দোষ। সব কথাতেই উপহাস। আমি বৈজ্ঞানিক আলোচনায় চপলতা পছন্দ করি না কিন্তু।" আমি চারি পাশের স্তূপীকৃত বইগুলো সরিয়ে ওকে কাছে এসে আমার পাশে ফরশে বসতে অনুরোধ করলুম, তারপর বললুম—

বেশ্ তো। কোন গুরু গম্ভীর আলোচনা শুরু করে দাও তা হলে। আমি তোমার গবেষণা শুন্‌তে এখন বিলকুল প্রস্তুত।

সে বললো,—

কেন? সব সময়ে আমিই যে আক্রমণ চালিয়ে যাবো আর তুমি শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকবে, তার মানে কি? তোমার তূণে কি বাণ নেই? না যুক্তিবাদের লৌহ দুর্গে আঘাত হান্‌তে ভয় পাও?

আমি বললুম,

আমার তূণীর যে ফাঁকা, সে-কথা তোমায় কে বললো? তবে ভাই, আসল কথাটা হচ্ছে,—ঘর ভাংগার চাইতে গড়াই শক্ত! আর এর চাইতে মুশ্‌কিল এই যে, তোমার কোন ঘরই নেই যা ভাংতে যাবো, তুমি তো কিছুই মান না। তোমার কাছে অস্বীকার আর নেতি ছাড়া কি আছে বল? যদি কিছু মানতে, যদি কোন বিষয়ে কিছু দাবী করতে তা হলে তার উপর প্রশ্ন করা চলতো।

বন্ধু নাছোড়বান্দা। যিদ ধরলো, আজ আমাকেই প্রশ্নকারী হতে হবে।

আমি বললুম,---

বেশ! তা হলে আমার একটা ছোট্ট অথচ খুব সহজ প্রশ্নের জওয়াব দাও,—আচ্ছা! বল দেখি মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম?

সংগে সংগে এও বলে ফেললুম, বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চয় এ ক্ষুদ্র প্রশ্নের সমাধান করে রেখেছেন! তোমার সিদ্ধান্তটা আমি জানতে চাই।

বন্ধুবর যেন একটু ঘাবরিয়ে গেল, ধীরে ধীরে বলতে লাগলো,—

প্রশ্নটা অনর্থক বলে মনে হচ্ছে, এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি?

আমি বাধা দিয়ে বললুম,—

হয়তো তোমার কথাই ঠিক! কিন্তু যদি---আমার মত জিজ্ঞাসা কর, তা হলে আমি বলবো এ প্রশ্নটাকে আমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করি, আর তোমার মুখ থেকে এর জওয়াব শুনার জন্য আমি ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছি তুমিই আমায় প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছ, এখন জওয়াব দিতে ইতস্ততঃ করা তোমার উচিত নয়।

সে বললো,—

প্রশ্নটা শুনতে খুব সহজ বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু এর ভিতর সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনা নিহিত রয়েছে। হয় তুমি প্রশ্নটাকে অন্য আকারে উপস্থিত কর, নয় তোমার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বল।

আমি,---তুমি বড়ই ভয় পাচ্ছ দেখছি। অথচ দেখ, তোমার মত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদীর ভয় করার মত কিছু এ প্রশ্নের ভিতর নেই, এ প্রশ্নটাকে কি তুমি একটা ফাঁদ মনে করেছ যাতে জড়িয়ে পড়ার আশংকা করছ? আমি এ বিষয়ে এই টুকুই জানি যে, ডিম মুরগীর পেট থেকেই বেরোয় আর ছানা থেকেই মুরগী হয়।

সে আমার কথায় সায় দিল।

আমি পুনরায় বললুম—

যদি এ কথা সত্য হয়, তা হলে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের (Geology) বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস লায়েল কি বলেন নাই যে,—"অতীতকে বর্তমানের প্রমাণ—দিয়ে প্রকাশ করতে হবে?"

সে বললো—নিশ্চয়।

আমি,—তা হলে ডিম আর মুর্গীর এ ব্যাপার চিরকাল এই ভাবেই চলে আসছে?

বন্ধু আবার বললো—নিশ্চয়।

আমি,—তা হলে নিশ্চয় সর্বপ্রথম মুর্গী আর সর্বপ্রথম ডিম নিজের নিজের জায়গায় স্বতন্ত্রভাবেই বিদ্যমান ছিল?

সে দৃঢ় কণ্ঠে বললো,—এতে সন্দেহ করার কি আছে?

আমি বললুম,—এতে যদি সন্দেহ করার কিছু না থাকে, তা হলে সর্বপ্রথম মুর্গী ডিমের আগেই জনমেছে বলে স্বীকার করতে হবে, কারণ ও ডিম থেকে বেরোয় নি। আর এ কথা মানতে গেলে স্যর চার্লসের থিওরী ভেঙ্গে যাচ্ছে, কারণ বর্তমানের প্রমাণ তার উল্টো। আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করছি সমস্ত মুর্গী ডিম থেকে বেরুচ্ছে আর বর্তমানের এই প্রমাণ দিয়ে এত প্রতিপন্ন হচেছ যে, চিরকাল মুর্গী ডিম থেকেই জন্মে আসছে। অথচ তুমি এই মুহূর্তেই স্বীকার করেছ যে, প্রথম মুর্গী ডিম থেকে জন্মে নি।

বন্ধুবর অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর হুংকার দিয়ে উঠলো,—

কি করে জানলে তুমি যে, সর্বপ্রথম মুর্গী ডিম ছাড়াই জন্মেছিল? মুর্গীর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, ওটী ডিমেরই উন্নত ও পূর্ণ সংস্করণ মাত্র। আমরা যদি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিন্তা করে দেখি, তা হলে এক্ষুণি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবো যে, ডিমই প্রথমে জন্মেছে। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, সর্বপ্রথম মুর্গী ডিম থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমি বললুম—

উত্তম কথা। তা হলে সাব্যস্ত হলো সর্বপ্রথম মুর্গী ডিম থেকেই হয়েছে, অর্থাৎ কিনা ডিমের অস্তিত্ব মুর্গীর আগেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তোমার এ অভিমত স্বীকার করে নিলেও তো লায়েলের থিওরী টিকছে না। আমরা সর্বদাই দেখছি সমস্ত ডিম মুর্গীই প্রসব করছে' তারপর দয়াকরে এটাও আমাকে বলে দাও যে, সর্বপ্রথম ডিম যদি মুর্গী

প্রসব না করে থাকে তাহলে ওটা আসলো কোথেকে? কেমন করে আসলো? কবে আসলো?

বন্ধুবরের অট্টহাস্যে আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরী কেঁপে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো—

বুঝেছি মওলানা, মোল্লার দৌড় মছজিদ তক। তুমি আমায় স্বীকার করাতে চাও—সর্বপ্রথম ডিমটী তোমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছে—কেমন?

আমি বিমর্ষতার ভান করে বললুম—দেখ ডক্টর, আমি হচ্ছি জিজ্ঞাসু, আমি উত্তর দাতা নই। অবশ্য আমি জানি যে, ঐশী গ্রন্থের মান্যকারীরা এ প্রশ্নের নিতান্ত মামুলী ধরণে জওয়াব দিয়ে মুক্তি পেতে চান যে সর্বপ্রথম ডিম স্বয়ং আল্লাহ বানিয়েছেন। কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ নেই।— তুমি তাই, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং যুক্তিতর্কের সাহায্যে এ প্রশ্নটার সমাধান করে দাও, তা হলে আমি সত্যই তোমার কাছে বাধিত থাকবো।

সে পরম বিজ্ঞের মত বলে উঠলো— এই ডিমের প্রশ্নটাকে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর খাটাতে চাও না কি হে?

আমি পুনরায় বিনীত ভাবে বললুম,—স্বভাবতঃ! নিশ্চয় গোড়াতে ধানের সর্বপ্রথম বীজটী বিদ্যমান ছিলই, সর্বপ্রথম বিড়াল, সর্বপ্রথম গাভী, সর্বপ্রথম বকরী, সর্বপ্রথম মানুষ গোড়াতেই মওজুদ ছিল। যদি তুমি ডিমের সমস্যাটা মীমাংসা করে দিতে পার, তা হলে অন্যান্য বস্তুগুলিকেও আমি ওই মীমাংসার উপর কল্পনা করে নেবো আর এই ভাবে সৃষ্টিরহস্যের গুপ্তদ্বার আমরা জগদবাসীর জন্য উদ্‌ঘাটিত করে ফেল্‌বো।

বন্ধু বল্‌লো,—

সৃষ্টির প্রশ্নটা একদম সেকেলে। ওতে নূতনত্ব কিছুই নেই। আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত বস্তুই ক্রামশিক বিবর্তনের ফলে প্রকাশ পেয়েছে।

আমি বললুম,—

হতে পারে! কিন্তু জীবনের গোড়ার কথা ওর মধ্যে ধর্তব্য হবে কি করে? জীবনের প্রথম বীজটা সৃষ্টি না হয়েই পারে না। তুমি নিশ্চয়—জেনো, তোমার বিবর্তনবাদ আমাকে ধমকিয়ে নিরস্ত করতে

পারবেনা। বিবর্তনবাদের জন্যও প্রথমে একটা জিনিষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, তবেই ওর ক্রামশিক উন্নতি ঘটবে। যার অস্তিত্বই নেই, তার বিবর্তন ঘটবে কি করে? অতএব প্রথমে ডিমের অস্তিত্বটা মেনে নেও, তারপর ওর উপর বস্তুতত্ত্বের ইমারৎ গেঁথে তোল। আমি আমার—প্রশ্নটার পুনরুক্তি করছি—মুর্গীর ডিমটা যে কোথেকে এলো?

সে বললো, আমি বৈজ্ঞানিকদের থিওরী বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেকটি প্রাণী অংগ অবয়ব-শূন্য প্রাণহীন উপাদান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

আমি বললুম,—তাই নাকি? কিন্তু আমি যতদূর জানি, হাক্সলে, অগেল প্রভৃতি তোমার ঐ বৈজ্ঞানিক ডগমা অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন,—সকলেই সেই প্রাচীন মতবাদ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এক প্রাণীর অন্য প্রাণী থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে।

আমার কথায় বন্ধুবর একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াল, বল্লো,—আর একদিন এ বিষয়ে আলাপ করা যাবে।

* * *

কয়েক দিন পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ডক্টর নঈম এসে উপস্থিত হলো। বসতে না বসতেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে কি তুমি প্রাণহীন জড়পদার্থ থেকে প্রাণের উদ্ভব হওয়াকে স্বীকার করনা?

আমি বললুম,—

দেখ, আমার স্বীকার বা অস্বীকারের কোন প্রশ্ন এখানে উঠছে না, তোমার গুরুদেবরাই ও মত খণ্ডন করেছেন। আমি এমন একটা ডিমের কথা তোমার কাছ থেকে জান্‌তে চেয়েছিলুম যা জীবন্ত উপাদানে গঠিত। তুমি ডক্টর বস্টনের অভিমত—আমাকে শুনিয়ে দিলে যে, সর্বপ্রথম ডিম প্রাণহীন উপাদান হতে উদ্ভূত হয়েছে, অথচ আমার প্রশ্ন ছিল প্রাণময় ডিম সম্পর্কে। যাক, তোমার খাতিরে আমি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি, সর্ব প্রথম ডিম প্রাণহীন, অংগ অবয়ব শূন্য উপাদান থেকেই জন্মেছে। এই ধর—আমরা মেনে নিচ্ছি যে, সর্ব প্রথম ডিমের উৎপত্তি বালির ক্ষুদ্র একটী কণা থেকেই ঘটেছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করার পরও আমার প্রশ্ন নিজের জায়গায় ঠিক থেকে যাচ্ছে, কেবল শব্দের একটু রকম ফের ঘটছে মাত্র। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে আবার সেই প্রশ্নই উপস্থিত হচ্ছে যে, বালির এ কণা কোথেকে এলো?

বন্ধু বললো,—

বালির কণা আর অন্যান্য উপাদানগুলি এমন কতকগুলি সূক্ষ্মতম পরমাণু নিয়ে গঠিত হয়েছে,—যা মানুষের পক্ষে দর্শন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়, মহাশক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও নয়। তথাপি তাদের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আপাততঃ ৬৪ টী উপাদানের কথা স্বীকৃত হচ্ছে কিন্তু বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করতে থাকবে ওদের সংখ্যা ততই কমে আসবে। আমরা এমন যুগের প্রত্যাশা করছি যখন এ কথা যোরে-শোরে বলা চলবে যে, একমাত্র হাইড্রোজেন বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুর মূল, সমুদয় বস্তুর উদ্ভব হাইড্রোজেন থেকেই ঘটেছে।

আমি বললুম,—

অনেক ক্ষণে তুমি একটা কাজের কথা শোনালে, তার জন্য আগে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। এখন দয়া করে বল যে, নিখিল বিশ্বের যদি হাইড্রোজেন থেকেই উদ্‌ভব ঘটে থাকে, তাহলে মুরগদের সেই মাননীয়া পরদাদী ছাহেবা, যিনি সর্বপ্রথম ডিম পেড়েছিলেন কেমন করে সৃষ্টি হলেন, অবশ্য তিনি যে স্বয়ং ডিম থেকে জন্মেন নাই, তা তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে।

বন্ধুবর গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললো—সর্বপ্রথম মুর্গী জন্মে নাই, বিকাশ লাভ করেছিল।

আমি বললুম—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমার ত্রুটী মাফ কর, এখন বল, সর্বপ্রথম মুর্গী কোন বস্তু থেকে বিকাশ লাভ করলো?

বন্ধু বললো,—আমি জানি না।

আমি পুনশ্চ বললুম,—তাহলে তুমি তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যে অক্ষম তা স্বীকার করছো?

বন্ধু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললো—আমি কি সব্‌জানতা?

আমি বললুম,—তোমার অজ্ঞতার প্রকাশ্য স্বীকৃতির জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর, কিন্তু তুমি বলেছ যে, প্রাণের প্রথম উপাদানকে সৃষ্টি করা হয় নি। এখন আমরা বিশ্বচরাচরের মূল ও সূচনার আলোচনায় উপস্থিত হলুম কিন্তু হাইড্রোজেনিক ডিম সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা—সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই বলতে পারলে না।

বন্ধুবর বললো,—আমার অজ্ঞতাকে যতই তুমি কটাক্ষ কর, আমি থোড়াই তা গ্রাহ্য করি। আমি বরাবর দাবী করতে থাকবই যে, সৃষ্টির যে কাহিনী তওরাতে কথিত হয়েছে, বিশ্বচরাচরের সে ভাবে কখ্‌খনো সৃষ্টি হয় নাই।

আমি বল্‌ল্‌ুম,—

ভাই, চরাচর কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটুও মাথা ব্যথা নাই; যে ভাবেই হোক ওর উদভব ঘটেছে নিশ্চয়ই।

বন্ধুবর বললো,—

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করে নিচ্ছি যে, বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। অবশ্য আমাদের আশা আছে শীঘ্রই হোক বা দেরীতে, সৃষ্টির রহস্যজাল ছিন্ন হয়ে যাবেই আর তাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কোন প্রয়োজন হবে না।

আমি বল্‌ল্‌ুম,—

মূর্খতা সত্ত্বেও তোমার যে দম্ভ, সেটা আমার কাছে প্রীতিকর না হলেও নিজের অজ্ঞতা যে সহজেই মেনে নিয়েছ তার জন্য আমি তোমার প্রশংসা করছি। তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে রাত্রির মত আজ আলোচনা স্থগিত রাখা যাক।

বন্ধুবর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললো,—ওঃ। মনেই ছিলনা, আমাকেও এক্ষুনি ফিরতে হবে। তুমি তো নীরস মোললা, তোমাকে বলে লাভ কি? রাত্রে নাচের একটা ভাল মজলিছ আছে—গুড্‌ নাইট।

*　　　*　　　*

বন্ধুবর পরবর্তী সন্ধ্যায় যথারীতি উপস্থিত হল। বললো,—কালকার আলোচনাটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তুমি এখন কি বলতে চাও?

আমি বলল্‌ুম,—ডক্টর, সত্যই কি তুমি বিশ্বাস কর যে, শিলা, উদ্ভিদ এবং জন্তু সমস্তই এক হাইড্রোজেনরই বিভিন্নরূপী সংমিশ্রণ মাত্র?

সে বললো,—নিশ্চয়!

আমি বলল্‌ুম, শূন্যপাত্র থেকে কোন জিনিষ বের করা কি সম্ভব?

সে বললো,—কখ্‌খনই নয়! কিন্তু ব্রদর আমি কবে তোমায় বললুম যে, হাইড্রোজেন একটা শূন্য পাত্র।

আমি বললুম,—সেকথা তো আমিও বলিনি। আচ্ছা কথাটা অন্যভাবেই জিজ্ঞাসা করি—যে পাত্রে যে পরিমাণ বস্তু নেই ততটা কি সে পাত্র থেকে বের করা যেতে পারে?

সে বললো,—না।

আমি,—তুমি কি মনে কর যে, প্রাণের উপাদান হাইড্রোজেন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে?

সে বললো,—নিশ্চয়। সমস্ত ছাতা জাতীয় দেহ (Fungi), উদ্ভিদ, জন্তু, সমুদয় শিল্পী, চিত্রকর, কবি, গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—মোটের উপর গোটা সৃষ্টি এই হাইড্রোজেনী ডিম থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে।

আমি বিস্ময়ের ভান করে বললুম,—এই বিস্ময়কর, তেলেছমাতী ডিমের গুণাগুণ আর বৈশিষ্ট্যের কথা আমায় শুনাবে একটু?

সে বললো,—ওর মধ্যে জাদুটাদু কিছুই নেই, এ হলো নেচর। বিশ্বচরাচরের জননী।

আমি,—হাঁ, হাঁ,—জগজ্‌জননী, মা ঠাক্‌রুণ। কিন্তু ঐ আসল হাইড্রোজেনী ডিমের মধ্যে কিছু গুণ নিহিত ছিল নিশ্চয়? আচ্ছা—এই হাইড্রোজেন আসলো কোথেকে?

বন্ধু বললো,—তা আমি জানিনা।

আমি বললুম,—

আচ্ছা! এই অদ্ভুত গুণগুলি হাইড্রোজেনে—সৃষ্টি হল কি করে?

সে বললো,—

তাও আমি বলতে পারবো না।

আমি বললুম,—

তুমি বলেছ—হাইড্রোজেনে কতকগুলি গুণ ছিল যেগুলি ক্রমশঃ বিশ্বচরাচরকে প্রকাশ করলো। তুমি কি কল্পনা করতে পার যে, কোন ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা ছাড়াই হাইড্রোজেন থেকে এই বিপুলা ধরণীর যাবতীয় বস্তু নিজে নিজেই প্রকাশ পেয়ে গেল?

বন্ধুবর বললো—তুমি যে আকারে কথাটা পাড়লে, আমি সে ভাবে কখনো চিন্তা করে দেখিনি। বিষয়টা বাস্তবিক জটিল, আমি আপাততঃ এর উত্তর দিতে পারছি না।

আমি একটু দৃঢ়ভাবে বললুম,—তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই অদ্ভুত ডিম—এই হাইড্রোজেনের টুকরো, যা থেকে নিখিল বিশ্বের উদভব ঘটলো আর যা থেকে জীবজগতের প্রাণ লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লো—বুদ্ধিমত্তা আর ইচ্ছাশক্তি ছাড়াই প্রকাশ পেয়ে গেল কি? যদি হাইড্রোজেনের ভিতর প্রজ্ঞা ও অনুভূতি না থেকে থাকে তা হলে বন্ধু—তুমি যে হাইড্রোজেন থেকে প্রকাশ পেয়েছ--তুমি কেমন করে এত বড় জ্ঞানী আর ডক্টর হলে?

বন্ধুবর চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ালো। বললো আমি আজ আর কথা বলতে পারছি না—গুড নাইট।

... ...

মগরীবের নমাযের পর ডক্টর নছীমের প্রতীক্ষায় আমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ বাদ দিয়ে একটা গল্পের বই খুলে বসলুম। হঠাৎ একটা গল্পের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। এক রাজপুত্র তার প্রিয়তমাকে একটি লোহার ডিম উপহার দিয়েছিল। লোহার ডিম দেখে মানিনী অভিমান করে ডিমটি ছুড়ে ফেলে দিল। ডিমটি ভেংগে গেল, ওর ভিতরকার শুভ্রতা ছিল রৌপ্যের আর হরিদ্রাভা ছিল স্বর্ণের, হরিদ্রাভ দলার ভিতর সুবর্ণ খচিত ক্ষুদ্র একটি মুকুট আর হীরকের আংটি ছিল। এই গল্প পড়ে আমার ধারণা হতে লাগলো, যে ডিমের ভিতর সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ আর বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্নেহ, মমতা ভরপুর হয়ে রয়েছে, তার তুলনায়—রাজপুত্রের প্রেরিত ডিমটি কত অকিঞ্চিৎকর! আমি মনে মনে এই কথা নিয়ে ভাবাগোনা করছি এমনি সময়ে বন্ধুবর ডকটর নছীম উদিত হল আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো,—

কি ভাবছ হে?

আমি বললুম,—

ডক্টর, তুমি এমন কোন নদীর সংবাদ রাখ কি, যা কোন উৎস থেকে নির্গত হয়নি?

সে বললো,—

এতো খুব সহজ প্রশ্ন, না, এমন কোন নদী নেই।

আমি পুনরায় বললুম,—

কারণ ছাড়া কোন প্রতিক্রিয়ার কথা কল্পনা করা যায় কি?

সে বললো,—

সকল প্রকার প্রতিক্রিয়ার জন্য ক্রিয়া অথবা কারণ থাকা অপরিহার্য, কিন্তু কার্য ও কারণের প্রশ্ন বড়ই জটিল। তুমি কি ডেভিড হিয়ুমের সংগে এ বিষয়ে একমত নও যে, রাত্রি আর দিনের মধ্যে যে সম্পর্ক, কার্য ও কারণের ভিতরেও সেই রূপ সম্পর্ক রয়েছে?

আমি বললুম,—

না, আমার মত তা নয়, রাত্রির পর দিন আসে ঠিক, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কার্য্য ও কারণের সম্পর্ক রয়েছে সে কথা আমি মানিনা। সে কথা থাক, এখন এস, আমরা সেই তেলেছমাতী ডিমের কথাই আলোচনা করি। আচ্ছা ভাই, এ "নেচর"টা কি? কোথেকে এর আবির্ভাব ঘটলো? কখন ঘটলো? কেমন করে ঘটলো? তুমি এর সংজ্ঞা আমাকে বলতে পার?

বন্ধু বললো,—

নেচরের ডেফিনিশন সহজ নয়। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন,—"আকাশের তলায় চল আর নেচরের শিক্ষা ও বিধান অবগত হও।" আর একজন বলেছেন,—"নেচরের বৈচিত্র দর্শন কর, অণুগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করছে, একটী আকর্ষণ করছে, অপরটি আকর্ষিত হচ্ছে। নেচরের নৈকট্য তার মিলন-বাসরে তোমাকে চরিতার্থ করবে।"

আমি বললুম---

ভাই আমি কবি নই! তুমি নিজেই বলেছ, সর্বপ্রথম ডিম নেচর প্রস্তুত করেছে আর ওকে বিভিন্ন আকারের জীবিত ও সুন্দর মিশ্রপদার্থ নির্মাণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। সুদৃঢ় প্রমাণ ছাড়া আমি নেচরের এ যোগ্যতা স্বীকার করতে পারছি না। এই নেচরটী কি? তা আমায় বলতে হবে। ফেরেশ্‌তা না প্রেত? না আষাঢ়ে ভুত? নৈশ আঁধারের মুষলধারায় যার আগমন হয় আর প্রভাতে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না?

বন্ধুবর মুখ ভার করে বললো,---কাইগুলী—ঠাট্টা করোনা।

আমি বললুম,—

তুমিই বলেছ, নেচর সকল বস্তুর জননী, আর তার সন্তান সন্ততির সংখ্যা সমুদ্রোপকূলের বালুকাকণার চাইতেও বেশী ঃ তবুও তুমি ওকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ না। এটা কি উচিত?

সে বললো,—

নেচরের স্থান সব সময় পরিচয় আর ব্যাখ্যার উর্ধে। ওর আঁচলে আকাশ আর পৃথিবী দুটী শিশুর মত জড়িয়ে পড়ে আছে।

আমি বললুম,—

তুমি কি মনে করনা যে, নেচর একটী—অদৃশ্য শক্তির নাম মাত্র? যার সত্তা অণুপরমাণু হতে স্বতন্ত্র থেকে তার অভিলাষ সিদ্ধ করছে?

সে বললো,—

কখ্খনো নয়। নেচর কোন স্বতন্ত্র অদৃশ্য সত্তার নাম নয়, মানুষের শক্তি আর বুদ্ধির অগোচরে যা ঘটে তারই নাম নেচর। নেচরই আকাশ, পৃথিবী, ফুল পাতা, ক্ষেত আর সমুদ্রের মাছ আমাদের দান করেছে।

আমি বললুম—

কিন্তু তুমিই তো বলেছ যে, সমুদয় বস্তু সর্বপ্রথম হাইড্রোজেনী ডিম থেকে হয়েছে আর এই তেলেছমাতী ডিম নেচরের কাছ থেকে শক্তি লাভ করেছে, এখন এই ডিম আর নেচরে তফাৎ কি, আমি তাই শুনতে চাই।

বন্ধু বললো,—

এ দুইয়ের পার্থক্য আর বিশ্লেষণ বড়ই মুশকিল, কিন্তু এটা স্থিরনিশ্চয় যে, একটী অপরের কারণ নয়।

আমি বললুম,—

আচ্ছা তোমার খাতিরে সমস্তের গোড়ায় হাইড্রোজেনী ডিমের অস্তিত্ব যদি মেনেও নেওয়া যায় আর যদি স্বীকার করে নেই যে, ঐ হাইড্রোজেনী ডিম থেকেই বিশ্ব চরাচরের উদ্ভব ঘটেছে, তবুও কি তুমি এ কথা মানবে না যে, ঐ বিচিত্র ডিমের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক? আর সেই স্রষ্টার পক্ষেই ঐ ডিমের রক্ষক ও প্রতিপালক হওয়া উচিত? বিশ্ব চরাচরের এ বিবর্তন শুধু অনাদি ও অনন্ত আল্লাহর মহিমারই নিদর্শন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

বন্ধু বললো—

এ কথা আমি স্বীকার করি না।

আমি বললুম—

কেন স্বীকার করবে না? তা হলে বল আল্লাহর স্থান তুমি কাকে দিচ্ছ? যদি বাস্তবিক ডিম কার্য্যতঃ আদিতে বিদ্যমান ছিলই, তা হলে ওর বিদ্যমানতার জন্য একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তার বিদ্যমান থাকাও সন্দেহাতীত ভাবে আবশ্যক হচ্ছে আর যদি বল যে, ডিম নিজে নিজেই উদ্ভূত হয়েছিল, ও স্বয়ং নিজেকে সৃষ্টি করেছিল আর ও নিজেই নিজের রক্ষাকারী ও প্রতিপালক—তা হলে সেই স্বয়ম্ভূ সত্তাকেই তো আমরা বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা ও নিয়ামক আল্লাহ বলে থাকি। কিন্তু ওই ডিমের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করা ও পরিচালিত করার যদি কোন শক্তি না থেকে থাকে তা হলে তার চাইতে বৃহত্তর ও মহত্তর এমন কোন শক্তি অবশ্যই ছিল, যা ওকে চালিয়েছে আর যদৃচ্ছভাবে প্রয়োগ করেছে।

বন্ধুবর আমার প্রশ্নের জওয়াবের জন্য অবসর নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

*　　　　*　　　　*

পর দিন সন্ধ্যায় বন্ধুবর ডক্টর নছীম এসেই বলতে লাগলো—

দেখ মওলানা তোমরা যাকে আল্লাহ বলছো, সেটা শুধু একটা শৃংখলার নাম বৈ আর কিছুই নয়, যা বিশ্ব চরাচরে বলবৎ রয়েছে। স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, "সমুদয় প্রকাশ্যমান বস্তু অটল বিধানের অধীনে রয়েছে, ঐ বিধানগুলির পথে কোন প্রাকৃতিক বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তি বাধা জন্মাতে পারে না।"

আমি বললুম—

দেখ ডক্টর, মিল সত্যই ন্যায় শাস্ত্রে কতকগুলি চমৎকার বই লিখেছেন, তাঁর দার্শনিক আলোচনাগুলিতেও যদি তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অনুসরণ করে চলতেন, তা হলে বড়ই সুখের কারণ হত, কিন্তু দুঃখের বিষয় দার্শনিক আলোচনার বেলায় তিনি তাঁর ন্যায় ও যুক্তির খেই সমস্তই হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেছেন,—"সমুদয় প্রকাশ্যমান অর্থাৎ তারকারাজির গতি, আলুর ফসল, ক্রিকেট খেলা, মদের নেশা . . . . . ইত্যাদি।" যদি প্রকাশ্যমানের কথা তারকারাজি পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ করে

রাখতেন, তা হলে হয়তো ওঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারতুম না, কিন্তু মদের নেশা, আলু আর ক্রিকেট খেলার আলোচনায় আমরা ওঁকে নিরস্ত করতে পারি— নিরেট গোবেচারির দল হয়তো বলবে যে, ও সকল বিষয়ের সাথে অন্য কোন শক্তির সম্পর্ক নেই, কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে--অটল বিধানগুলির ভিতর এমন কোন বাস্তব শক্তি নিহিত রয়েছে, যা মানুষকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে সতত অদৃশ্যভাবে আকর্ষণ করে থাকে। মিল তাঁর ন্যায় শাস্ত্রের পুস্তকে স্বয়ং বলেছেন যে, "অটল বিধানসমূহের ভিতর প্রভুত্বের শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, এ শক্তি যদিও প্রকাশ্যভাবে প্রভুত্ব করে না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।" এখন বল দেখি নেচর বলতে তুমি কি বোঝ? নেচর আর নেচরের বিধানসমূহের পার্থক্য কি? আমি হাক্সলে ও অশ্রেল ইত্যাদির পুস্তকগুলি পড়ে অবাক হয়ে যাই, তাঁরা ইন্দ্রিয়াদির কর্ম, বিদ্যুৎ, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও জীব-বিদ্যা সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলে থাকেন, কিন্তু যেমনি দর্শন-শাস্ত্রের সীমানায় পা রাখেন অমনি ওঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি সব উবে যায়, একেবারে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মত কথা বলতে লেগে যান। সৃষ্টি-কর্তা, অলৌকিকতা আর সৃষ্টি প্রভৃতি শব্দের—বিতর্ক ও আলোচনায় তাঁরা তাদের সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি খরচ করে ফেলেন, খুব বেশী কৃতিত্ব তাঁদের এই যে, উপরিউক্ত শব্দগুলিকে নেচর, প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিধান ইত্যাদি শব্দে রূপান্তরিত করে থাকেন। আমি নেচর এবং প্রাকৃতিক বিধানের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যাখ্যা শুনতে চাই। একটার মধ্যে আর একটা ঢুকিয়ে দিয়ে—একটা জগাখিচুড়ি গোছের কৈফিয়ৎ দিয়ে তুমি আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। তুমি বলেছ প্রাকৃতিক বিধান এ-রূপ শক্তিমান যে ওর দ্বারাই সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, অথচ এ বিধানের প্রযোক্তা যে কে, তার কোন পরিচয় দিতে পারছ না। প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে তোমার এ গা-যোরী দাবী কেমন করে গ্রাহ্য করা যাবে?

বন্ধু বললো—

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সমবেত ভাবেই বলছেন যে, যাবতীয় ব্যাপার প্রাকৃতিক বিধানেই সংঘটিত হয়, কোন ব্যাপারেই এর ব্যতিক্রম নেই।

আমি বললুম,—

আমাদের দেশের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ধন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু ধন নিজেনিজেই যে ব্যবসা চালাতে পারেনা, তা বলা বাহুল্য। ধন স্বয়ং শক্তিমান প্রাণবন্ত বস্তু নয়। সমুদয় রাজত্ব আইন দিয়েই চলছে, কিন্তু আইন নিজেই সর্ব্বশক্তিমান নয়, জজ্ ম্যাজিস্ট্রেটরাই আইনকে বলবৎ করে থাকেন। বৈজ্ঞানিকরা বলেন,—নেচরের মধ্যে বংশানুক্রমিক ভাবে কতকগুলি শাশ্বত শক্তি বিরাজ করছে। ডারুইনের কথামত সেইগুলিই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধানের প্রযোক্তা শক্তি, যা দিয়ে নিখিল বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। উত্তম কথা। কিন্তু এটুকু আবিষ্কার দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের কি বাহাদুরী প্রতিপন্ন হলো? সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহর সংগে নেচর ও ল-অফ-নেচর নামে দুটী শব্দের বিনিময় ঘটান ছাড়া আর তোমরা কি কর্ত্তে পারলে? অর্থাৎ দুটী অন্ধ, বধির ও বোবা সত্তা। এই তো? যে গ্রীকরা এক অজ্ঞাত দেবতার পূজা করতো, তোমরা কি তাদের চাইতে নিকৃষ্ট নও? তুমি স্বীকার করছো যে, অস্তির ভিতর কোনপ্রকার সক্রিয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, অথবা হাইড্রোজেনী ডিমের মধ্যে প্রাণ ছিল, কিন্তু এই ডিম কি ভাবে তৈরী হলো, কেমন করে রক্ষা পেল, কি উপায়ে বিচিত্র রূপ ও প্রজ্ঞার অধিকারী হলো, তার কিছুই অবগত নও। প্রকৃত-প্রস্তাবে তোমরা স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ম্ভু আললাহর স্থানে যা আদৌ বিদ্যমান নেই, তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে চাও। আবার মযার ব্যাপার যে, একটী সক্রিয় শক্তির অস্তিত্বও মেনে যাচ্ছ আর বলছো—অণুপরমাণু অনাদি শক্তি দ্বারা বিকাশ লাভ করেছে! যাইহোক এখন অনুগ্রহ করে বল—এই হাইড্রোজেনী ডিমের কার সংগে জোড় লেগে ছিল? কেমন করে? কখন? কে ঐ ডিমে তা দিয়েছিল? কে ছানা প্রসব করিয়েছিল? তোমরা আললাহর নাম শুনলে আঁৎকিয়ে উঠ আর প্রাকৃতিক বিধান ও নেচরের নামে গলে যাও! উত্তম! কিন্তু একথা বলতে পারনা যে, মিস্টর ল অফ নেচরের সংগে মিস নেচরের কোর্টশিপ আর হনিমুন ঘটলো কি করে? সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো কি উপায়ে? মানুষের মনে একটী ক্ষমতাশালী সক্রিয় শক্তি নিশ্চয় বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সর বলছেন, সে শক্তিকে জানবার উপায় নেই। আমি তোমাকে বলতে চাই যে, ওয়াহীর স্বরূপ মানুষের বুদ্ধির

অগম্য ! স্পেন্সর আরও বলেছেন— নেচর একটী অজ্ঞাত শক্তির বিকাশ-মাত্র, মানুষ ওর রহস্য সম্বন্ধে একেবারেই মূর্খ। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হার্বার্ট স্পেন্সর কি করে বুঝলেন যে, প্রাকৃতিক বিধানের ঊর্ধে আরও একটী শক্তি রয়েছে? আবার ওঁর সহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলতে ছাড়েননি যে, আমাদের পক্ষে আদি অর্থাৎ সর্বপ্রথম কারণ (Firat Cause) সম্বন্ধে কোন দিনই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভবপর হবেনা। এখন ডক্টর, তুমি যদি এই সমস্ত উক্তির আলোতে অবিকৃত মন নিয়ে বিচার করতে বসো তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, নাস্তিক আর আস্তিকদের মধ্যে শাব্দিক ঝগড়া ছাড়া মতভেদ নেই। আস্তিকরা যাকে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ বলেন, নাস্তিকরা অবিকল ঐ বস্তুকেই নেচরের উর্ধতন শক্তি বলে অভিহিত করে থাকেন। উভয় দলেই উল্লিখিত শক্তিকে সক্রিয়, অনাদি ও অনন্ত বলেই স্বীকার করেন। তাঁদের সমস্ত ঝগড়া কেবল "আল্লাহ্" শব্দ নিয়ে। তাই নয় কি?

বন্ধু বললো,— কিন্তু দার্শনিকরা তোমাদের আল্লাহকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন। তোমরা তাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সর্বগুণধর আর জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিরও অধিকারী সাব্যস্ত করে থাক কি না।

আমি বললুম—তুমিও তো স্বীকার করছো যে, সেই অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব যদি লোপ পেয়ে যায়, তা হলে বিশ্ব চরাচরের কোন বস্তুরই উদ্ভব সম্ভবপর থাকবে না। এ কথা বলে তুমি কি আমার এ বিশ্বাসে অংশ গ্রহণ করছো না যে, এক মহান সক্রিয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে? এরপর এ কথারও উত্তর দাও যে, সেই সক্রিয় শক্তি থেকে এমন কিছু ঘটতে পারে কি যার অস্তিত্ব স্বয়ং তার মধ্যেই নেই? সরল কথায় যে শক্তি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও ধারক নয় সে তোমাকে কেমন করে বিজ্ঞ ও ধারণশীল করতে সমর্থ হল? তোমার মধ্যে এই বুদ্ধি আর বিবেচনা শক্তি কোথেকে এল?

সে বললো—আমি আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

আমি বাধা দিয়ে বললুম—বটেই তো। তোমার শ্রদ্ধেয় ঠাকুর দাদাদের মধ্যেই তো এক জন মহাপণ্ডিত বানর মশাই ছিলেন না?—

বন্ধুবর আমার কথায় চটে গিয়ে প্রস্থানোদ্যত হল। আমি মাপ চেয়ে ওর মানভঞ্জন করলুম, তার পর বললুম—

দেখ স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে নেচরের উর্ধে এক অজ্ঞাত শক্তি বিরাজ করছে, কিন্তু সাথে সাথে আরও অনেক বাহুল্য কথা উত্থাপন করে ফেলেছেন, অণু পরমাণু আর খণ্ডের অবতারণা করেছেন, তাদের আকৃতি ও ওজনের কথা বলেছেন, বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলি কি করে অখণ্ড হয়, তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর পরমাণু আর খণ্ডগুলি কি? সে কথার উত্তর নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, তাঁরা বলে থাকেন, ৬৪টী উপাদান আছে আর তার সবগুলিই হাইড্রোজেনের বিভিন্ন আকার প্রকার মাত্র। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়—এ হাইড্রোজেনটা কি? কোত্থেকে আর কেমন করে ওর আবির্ভাব ঘটে? তখন আর তাঁরা কোন উত্তর দেন না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা যোরে শোরে বলে থাকেন, তাঁরা বড় গলায় বলেন, আপেল ফল এই মাধ্যাকর্ষণের বলেই মাটিতে পড়ে, সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে আবার পৃথিবীও সূর্যকে আকর্ষণ করে থাকে। সবই স্বীকার করা গেল কিন্তু আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ. ধারণ এ সমস্ত কি? কোন জওয়াব নেই! তাঁরা ইথরের আলোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন, বায়ুর চাইতে তরল ও সূক্ষ্ম। এই ইথরের স্পন্দন ও কম্পনের ফলেই আমরা আলোর মুখ দেখি,—উত্তম কথা! কিন্তু এ ইথর বস্তুটা কি? তখন আর উত্তর মেলেনা। ফলে লারেগের মত ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হলো যে, বস্তুর ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু বস্তুর তত্ত্ব আমরা কিছুই অবগত নই।

* * *

পরবর্তী সন্ধ্যায় আমি পুনরায় বললুম,—তুমি কি বিশ্বাস কর যে, পরমাণু থেকে সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রাণী, এমন কি মানুষ পর্যন্তের মাঝখানে যতগুলি স্তর আছে, তার কোনটাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি?

বন্ধু বললো,—

নিশ্চয় না! অবশ্য প্রোফেসর ওয়েলস বলেছেন যে, নেচরে এমন অনেক অন্তরবর্তী যুগ কেটেছে যাতে বাইরের প্রভাব ওর সংগে যথেষ্ট মিশ্রিত হয়ে পড়েছে কিন্তু ডারুইন একথা অস্বীকার করেছেন। ওয়েলসের অভিমতের পিছনে কোন প্রমাণ নেই!

আমি.—ওয়েলস কি এ কথাও বলেননি যে, সংগীত-কলা, অংক বিদ্যা, প্রজ্ঞা আর অনুশোচনার ভাব মানুষ তার পূর্বপুরুষ জন্তুদের কাছ থেকে—কখখোনো উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেনি?

সে বললো,—তাঁর এ কথারও কোন প্রমাণ নেই।

আমি,—ওয়েলস আরও কি বলেননি যে,—মানুষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট যোগ্যতা আছে, যা তার অন্তরস্থ বিশিষ্ট আত্মা ও স্বভাবের সন্ধান দিয়ে থাকে?

সে বললো,—কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই।

আমি বললুম,—যদি ওয়েলসের সমস্ত কথাই তুমি উড়িয়ে দিতে চাও, তা হলে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তোমার নেচর এক অন্ধ মৃতবৎসা বৃদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার পেটে কতকগুলি মৃত ও অন্ধ বস্তুর পরমাণু বোঝাই ছিল আর সেগুলি অন্ধকারে আকস্মিকভাবেই বর্ধিত হয়ে উঠেছে। ওয়েলস এই কথাই বলেছেন যে, জড়জগতে প্রাণ বলে আর একটা দুনয়া আছে, যা পরমাণুগুলোকে সাহায্য করে আর তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে।

সে বললো,—

কিন্তু ওটাও ভিত্তিহীন উক্তি।

আমি বললুম,—

তোমরা দাবী করে থাক যে, সমুদয় অবিভাজ্য বা বিভাজ্য খণ্ড আর পরমাণুগুলিই সৃষ্টির প্রথম উপাদান, ওইগুলোই প্রথমে হয়েছে আর ওইগুলো থেকেই বিশ্বচরাচরের উদ্ভব ঘটেছে, অধিকন্তু তোমরা এ কথাও স্বীকার কর যে, উল্লিখিত খণ্ডগুলো তাদের সক্রিয়তা ও পরিপুষ্টির জন্য আর একটি উর্ধতন শক্তির মুখাপেক্ষী ছিল অথচ সেই উর্ধতন শক্তির পরিচয় যখন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কোনই জওয়াব দিতে পার না। কিন্তু ওয়েলস বলেন—"প্রাণহীন অংগ অবয়ব শূন্য উপাদান থেকেই প্রাণ শক্তির সঞ্চার হয়েছিল আর তাই থেকে অনুভূতিশীল প্রাণীর জনন কার্য্য ঘটেছিল, পরে এই অনুভূতিশীল প্রাণীই ক্রামশিক ভাবে বুদ্ধিমান মানুষের আকার পরিগ্রহ করলো। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, অন্তরবর্তী যুগগুলো এক অসামান্য

প্রজ্ঞা আর অদ্ভুত স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার দিকে ইংগিত করছে। মহিমা ও শৃংখলার—এ রহস্য যতই বুঝতে যাওয়া যায়, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠে যে, একটি আধ্যাত্মিক জগত নিশ্চয় বিদ্যমান রয়েছে আর যার বিপুলতার তুলনায় জড়জগত অকিঞ্চিৎকর।

বন্ধু বললো,—কিন্তু তোমার কথিত এই আধ্যাত্মিক জগতের প্রমাণ কি? যদি তুমি এর প্রমাণ দিতে পার তাহলে আমি বাধিত হব।

* * *

পরের সন্ধ্যায় আমি বন্ধুকে বললুম—

দেখ ডক্টর, তুমি কি একথা মানো যে, সৃষ্টির সূচনা থেকে সমস্ত অনুন্নত জাতির মধ্যেই ধর্ম বলে একটা জিনিষের অস্তিত্ব ছিল?

সে বললো,—হ্যাঁ।

আমি,—তাহলে তুমি একথাও মানো যে,—পাখীদের নীড় বাঁধা আর মৌমাছির মৌচাক তৈরী করা যেমন প্রকৃতিগত, তেমনি ধর্মকে স্বীকার করাও মানুষের প্রকৃতিগত?

সে বললো,—তাই মনে হয়।

আমি,—মানুষের প্রকৃতিতে ধর্মের এ ধারণা কি করে সৃষ্টি হলো?

সে বললো,—উন্নতি ও বিবর্ত্তনের সাহায্যে।

আমি,—অর্থাৎ যেমন বুনো আম থেকে গোপালভোগ, চিনে বাদাম থেকে কাঠ বাদাম উন্নতি লাভ করেছে, সেই ভাবেই মানুষ বানরের শ্রেণী থেকে উন্নতি লাভ করেছে তুমি কি এই কথা বলতে চাও?

বন্ধুবর বললো,—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা তাই বলে থাকেন।

আমি বললুম,—

মানুষ যখন বানরেরই উন্নত সংস্করণ, তাহলে বানরের মধ্যেও অনুন্নত ধরনের নৈতিক জ্ঞান—আর বিবেক বিদ্যমান রয়েছে? নিম্ন শ্রেণীর পশু পাখীর মধ্যে বিবেকের অনুভূতি না থাকলে তাদের উন্নত সংস্করণ মানুষের মধ্যেও ওর অস্তিত্ব পাওয়া যেত না। আর এ কথা মানতে গেলে এও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের নৈতিক জ্ঞান বানর থেকেই উদভূত ও উন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে, তারপর সে ক্রামশিক ভাবে ধর্ম আর মতবাদ সম্বন্ধে চিন্তা করতে লেগে গিয়েছে, অবশেষে সে তওরাৎ, ইনজীল ও কোরআন লিখে ফেলেছে আর এই ভাবে জগত জুড়ে ধর্ম প্রচার লাভ করেছে। তাই নয় কি?

বন্ধু বললো—নিশ্চয়।

আমি বললুম,—

তাহলে এবারে বানরের চাইতেও নিম্নস্তরে নেমে সাপ, বিছে আর মাছদের সম্বন্ধেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, ওদের মধ্যেও ধর্মপরায়ণতার ভাব বিদ্যমান রয়েছে, তারপর প্রাণশক্তির প্রথম উপাদান কাদা, আর তার পরমাণুগুলি—সম্বন্ধেও আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, ওগুলিও অল্প বিস্তর ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ; কেমন? এর পর আরও কয়েক ধাপ নেমে আমাদের হাইড্রোজেন—অর্থাৎ সেই বিচিত্র ডিমের সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়ান উচিত আর ভক্তিভরে স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য যে, ঐ ডিমটীও ধর্মীয় অনুভূতিতে ভরপুর ছিল, নয় কি? ভাই নছীম, আল্লাহর কছম! তোমাদের এই ডিম কিন্তু সমস্ত পীর পয়গম্বরদের মুজেযার ঠাকুর দাদা!

বন্ধুবর আমার মুখ থেকে মু'জেয়া শব্দ উচ্চারিত হতে শুনে বিষম চটে গেল। বললো,—জ্ঞান-রাজ্যে অলৌকিকতা বা মুজেযার কথা মূর্খরাই বলে থাকে, তুমি মওলানা, ও শব্দটা আমার কাছে উচ্চারণ করোনা। তুমি নেচরের প্রকৃতিকে অদ্ভুত বলতে পার।

আমি বললুম,—

আচ্ছা, আচ্ছা! মুজেযা শব্দটা যখন তোমার এতই অরুচিকর আমি ওর পরিবর্তে অদ্ভুত শব্দটাই নাহয় মেনে নিচ্ছি! কিন্তু ডক্টর, তুমি যাই বল, চটলে চলবে না। তোমাকে বলতেই হবে যে,—হার্বার্ট স্পেনসরের অনুগামীদের এ মতবাদ তুমি স্বীকার কর কিনা যে, প্রকাশ্যমান আকাশ ও পৃথিবী সমস্তই এক গোপন ও অজ্ঞাত শক্তির প্রতীক? যা সমস্তের পিছনে কার্যকরী হয়ে রয়েছে? আমার পরিভাষায় আমি ওই শক্তিকেই "আল্লাহ" বলে থাকি! এতে তোমার আপত্তি করার কছু আছে কি?

বন্ধু কোন উত্তর করলোনা।

আমি বললুম,—আচ্ছা! নিজের কর্মে ও আচরণে মানুষের কিছু স্বাধীনতা আছে কি? না সে মেশিনের ক্ষুদ্রতম অংশের ন্যায় নিজের ইচ্ছা ও রুচি ছাড়াই সবকিছু করে যেতে বাধ্য হচ্ছে?

সে বললো,—কলভিনের মত হচ্ছে যে, মানুষের কর্মে ও আচরণে তার একটুকুও স্বাধীনতা নেই। হত্যাকারী হত্যা করতে বাধ্য বলেই

সে হত্যা করে থাকে। মানুষ যা কর্বে তা পুর্বেই নির্ধারিত হ'য়ে রয়েছে, সে একেবারেই নিরুপায়!

আমি বললুম,—যারা এরকম মত পোষণ করে, তাদের সবগুলোকে একত্রিত ফাঁসীকাঠে ঝোলান উচিত! এ উপায় অবলম্বন না করলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারবে না!

আচ্ছা ডক্টর, এইবারে আমি তোমায় একটা শেষ প্রশ্ন করবো। আমরা সব্বাই যাচ্ছি কোনদিকে?

বন্ধু বললো,—মৃত্যুর দিকে! আমরা সকলে মরণের দিকেই এগিয়ে চলছি! যেদিন তুমি মরবে, সেদিন থেকে তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অবশ্য—দেহের অণুপরমাণুগুলো চিরজীবী, ওগুলি কোনদিন লুপ্ত হবে না কিন্তু যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বা বিবেক বলি, চিরকালের মত তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি কিয়ামৎ অর্থাৎ পুনর্জীবনের কথা আদৌ বিশ্বাস করিনা, পরবর্তী জীবনের সুখসম্ভোগের আমার কোন আশা নেই। মরার সঙ্গে সঙ্গে নেতির রাজ্য—আর কিছুই নেই, কিছুই থাকবেনা। তুমি নিত্যই লোকদের মরতে দেখ, তাদের জীবনের বাতি নিভে যায়, শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথে তাদের জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গুলির বিলুপ্তি ঘটে, মানুষ মাটিতে মিশে যায়, যে মাটি থেকে তার উত্থান ঘটেছিল, সেই মাটিই তার সর্বশেষ পরিণতি।

আমি বললুম,—

তা হলে তোমার এই বিবর্তনবাদ একটা অভিশপ্ত মতবাদ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। পরিণামেও এই মতবাদের কোন সার্থকতা নেই! কত শীগগীর সে মানুষকে নিঃশেষ করে ফেলে! গোড়ায় মানুষকে অনন্তজীবনের প্রলোভন দেখাতে থাকে, তারপর হতভাগা যখন তার ফাঁদে একবার পা দেয় অমনি তাকে একদম নিরাশ করে পরিত্যাগ করে। তোমার বিবর্তনবাদের জালে একবার যে আটকা পড়েছে তার জন্য আশা আর বিশ্বাসের কোন ক্ষীণ রেখাই নেই!

সে বললো,—

যা বাস্তব, আমাদের তারই অনুসরণ করতে হবে, ফলাফলের কথা চিন্তা করা নিরর্থক!

আমি বললুম,—

তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে, বয়স ফুরোবার সংগেই মানুষের দেহের অংশ ও উপাদানগুলি—নিশ্চেষ্ট হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ প্রকৃত প্রেরণাশক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে আর সমস্ত কলকারখানা থেমে যায়। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহলে আমরা আবার সেই তেলেছমাতী ডিমের সম্মুখীন হয়ে পড়ছি। স্বাভাবিকভাবে একথা মানতেই হবে যে, ডিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন শক্তি নিহিত ছিল, তবেই তো নির্ধারিত সময়ের পর তার শক্তি উবে গেল। এরপর মাত্র দুটী ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যেতে পারে—হয় অনন্ত মৃত্যু, নয় পুনর্জীবনের সূচনা। বন্ধুবর, তোমার যে নেচর একবার সেই তেলেছ-মাতী ডিমকে তার অসামান্য শক্তির প্রতীক করে নিয়েছিল, কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করার পর আবার নূতন শক্তিতে কি তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না? আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পক্ষে এটা ভয়াবহ রূপে হানিকর নয়কি যে, সৃষ্টি ঘটলো আমাদের বানরের বীর্য্য থেকে আর আমাদের পরিণতি হলো চরম বিলুপ্তি? এ জীবন আর এ মরণ উভয়ই অত্যন্ত কুৎসিত আর ন্যাক্কার জনক। কত বড় আশ্চর্য কথা যে, মানুষের মধ্যে যেগুলি বস্তু সব চাইতে উৎকৃষ্ট ও গৌরবজনক অর্থাৎ তার প্রতিভা, তার বিবেক, তার ব্যক্তিত্ব, তার প্রজ্ঞা সেগুলির তো অনন্তকালের মত বিলুপ্তি ঘটে গেল আর তার হাড়, মাশ, গু-গোবর এ সমস্ত অমর হয়ে থাকলো! এ কেমন ন্যায়শাস্ত্র, কি রূপ যুক্তিবাদ আর কোন্ ধরনের দর্শন—তা তুমি ভাবতে পার কি?

আমার শেষ কথাগুলো শুনে বন্ধুবর ডক্টর নছীমের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, সে গভীর চিন্তায় ডুবে পড়লো। আমি অনুভব করলুম একটা বড় রকম দীর্ঘশ্বাস সে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।— আমি গভীর স্নেহভরে আমার বাল্যবন্ধুর দুখানা হাত চেপে ধরলুম, বললুম—তুমি আজ বিশ্রাম কর কিন্তু মানব জীবনের দুরপনেয় কলংক আর তার ভাবী নৈরাশ্যের চরম আঁধারকে কালকার প্রভাতের আলোর সংগে ঝেড়ে ফেলে দিও।

আজ বিদায়ক্ষণে ডকটর নছীম ডি, এস, সি-এফ, আর এস গুড-নাইরেট পরিবর্তে আমাকে বলে গেল,—আছছালামো আলায়কুম।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফীর রচনাপঞ্জি

ক. গ্রন্থ

'ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র'
প্রকাশক ও মুদ্রক : সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৪৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০৪।

'কলেমা তৈয়বা'
প্রকাশক ও মুদ্রক : সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৪৮
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৯।

'পাকিস্তানের শাসন সংবিধান'
প্রকাশক ও মুদ্রক : সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫১
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১২।

'ঈদে কুরবান'
প্রকাশক ও মুদ্রক : সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৫২
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০।
[৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড থেকেও এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়]।

'সিয়ামে রামাযান বা ইসলামী কৃচ্ছ্রসাধনা'
প্রকাশক ও মুদ্রক : সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮।

[এর ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৬ সালে ৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়]

'মুছাফাহা'
প্রকাশক : এম. এ. বারী
৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
২য় সংস্করণ : কার্তিক ১৩৬৮
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩০।

'তিন তালাক প্রসঙ্গ'
প্রকাশক ও মুদ্রক : এম.এ. বারী, ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০।

'গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুল মালের বন্টন ব্যবস্থা'
প্রকাশক ও মুদ্রক : এম.এ. বারী, ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৫।

'জন্ম নিরোধ'
প্রকাশক : ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ?।

'নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী'
প্রকাশক : এম.এ. বারী, ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ?।

'তারাবীহ'
প্রকাশক : এম.এ. বারী, ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭৬।

'আহলে হাদীস পরিচিতি'
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ এম.এ. বারী, ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা
দ্বিতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ১৯৮৩
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১৫৯।

'আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য'
প্রকাশকঃ এম.এ. রহমান, ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৪
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ১২।

'ইসলামী জামাত বনাম আহলে হাদীস আন্দোলন'
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৫৫
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ?।

'আহলে কিবলার পিছনে নামায'
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ এম. এ. রহমান, ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা ও সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৬
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ২৪।

'নবুওতে মোহাম্মদী'
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৩২৫।

'ইসলামী অর্থনীতির ক খ'
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা
প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৫৬
পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৭৪।
[৯৮, নওয়াবপুর রোড থেকে ১৯৮৫ সালে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়]।

'ধন বন্টনের রকমারি ফর্মুলা'
প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সৎসঙ্গ প্রেস, পাবনা

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৫৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৮।

'আল ইসলাম বনাম কমিউনিজম'
প্রথম প্রকাশ ঃ এম.এ. বারী, ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৫৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০।

'ফির্কাবন্দী ও অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি'
প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ এম, এ, বারী, ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৬৩
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২১৬।

'মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম'
প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ এম, এ, রহমান, ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ১৯৭৪
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২।

এ ছাড়া আব্দুল্লাহেল কাফী রচিত 'পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য ও গঠনতন্ত্র' এবং 'যওউললাসে' নামে উর্দু ভাষায় চল্লিশের দশকে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। উপর্যুক্ত দুটি প্রকাশনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

আব্দুল্লাহেল কাফীর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পুস্তিকা অপেক্ষা অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ এবং 'আরাফাত' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক যে সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য প্রকাশ করেছেন, তা থেকে অপ্রকাশিত গ্রন্থ/পুস্তিকার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে তুলে দেয়া হলো :

ক. 'আল আহকাম' (আরবী ভাষায়)
পৃষ্ঠায় সংখ্যা ঃ ৪০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৬৫ হিজরী।
(ইসলামী ফিকহের মুলনীতি এতে আলোচিত হয়েছে)।

'কাশফুল কুন্নাঅ' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০৪
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৭ হিজরী।
(ইজমা সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা)।

'মিনহাজুল ইসতাকামাহ' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১১৫
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫০।
(ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসারে জামাত ও ইমামত সম্পর্কে আলোচনা)।

'তারাজিম রেজালিল ফেরাক' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা দেয়া নেই
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৩ হিজরী।
(বিচ্ছিন্ন ও নিন্দিত দলসমূহের ইতিহাস)।

'কিতাবুল ঈমান' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৩ হিজরী
(আল্লাহ ও তাঁর তৌহিদ সম্পর্কে মুসলমানদের বিভিন্ন ফ্রির্কা, তাদের মতবাদ ও কুরআন হাদীসের আলোকে তুলনামূলক আলোচনা)।

'রদ্দে উরুস' (উর্দু ভাষায়)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৩ হিজরী।
(উরসএর বিরুদ্ধে দলিল সহ প্রমাণ পেশ)।

'রদ্দে খানকাহ' (ঐ)
পৃষ্ঠাসংখ্যা ঃ ৫০
রচনার সময়কালের উল্লেখ নেই।
(খানকা ও মিথ্যা পীরের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ)।

পাণ্ডুলিপির নাম নেই (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৫

রচনার সময়কাল ঃ ১৩৬০ হিজরী
(বৃটিশ ভারতে উর্দু সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ বিষয়ে বক্তব্য।)

'আল ইকতদা' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫২
(আহলে হাদীস ও হানাফীদের পরস্পরের পেছনে নামাজ আদায় বিষয়ে প্রমাণিত দলিল সহ আলোচনা।)

'আল কাফীয়াতুশ শাফীয়াহ (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৯৩০-১৯৪২।
(উপর্যুক্ত সময়কালের বিভিন্ন মসয়ালার জবাব।)

পাণ্ডুলিপিটির নামকরণ নেই (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৬ হিজরী।
(ভ্রান্ত নবুয়তের দাবীদারগণের ইতিকথা।)

'নূরুল হুদা' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০
(সুফী মতবাদ, মৌলুদ, পীরের সিজদা প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।)

'আলকিসতাসুল মুস্তাকীম' [আরবী ও উর্দু মিশ্রিত ভাষা]
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৯ হিজরী,
(আলেম ও ইমামদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এতে আলোচিত হয়েছে।)

'শামামাতুল আম্বর' (আরবী)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬০৬
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৬৩ হিজরী।
(যাকাত, ফিতরা এবং তা আদায় ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

'হুসনুল মাসীয়ী (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৬০ হিজরী।
(কোরবাণীর যাবতীয় মসায়ালা ও জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।)

'আল বারাহীনুল মোহাম্মদীয়া, (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৬৩ হিজরী
(কুরআন, হাদীস এবং বাইবেলের আলোকে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর হুলিয়া মুবারকের বর্ণনা।)

'তারীখুল খাওয়ারিজ' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫২ হিজরী।
(খারেজীদের ইতিহাস।)

'আদ দুররুল মুতাল্লাকাহ' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৪
রচনার সময়কাল ঃ নেই।
(কতিপয় জটিল মসয়ালা আলোচিত।)

'শামামাতুল আম্বর' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৫৪ হিজরী।
(কতিপয় জটিল পত্রের জবাব সহ আলোচনা।)

'মেরা সফরে হজ্ব' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০
রচনার সময়কাল ঃ ১৯৪২
(তাঁর হজ্ব সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।)

'আল ইফশা' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২৫

রচনার সময়কাল: ১৩৪৮ হিজরী
(জায়েজ নাজায়েজ বিষয়ে আলোচনা)।

'আদদুররাতুল মুনীফাহ' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৯০
রচনার সময়কাল: ১৩৫৭ হিজরী।
(আকিকার মসনুন তরিকা)।

'আল হাদীয়েল মসনুন (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫
রচনার সময়কাল: ১৩৫০ হিজরী।
(কট, কবলা, রেহান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা)।

'আর রাসায়েল' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৫০
(১৯২৭ হতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রচিত জরুরী বিষয়ের মোট ২৫ খানা পুস্তিকার সঙ্কলন)।

'তসাওয়ারে শাইখ বা অজপাযোগ' (বাংলা ভাষায়)
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০
রচনার সময়কাল: ১৩৫২ হিজরী।
(আধ্যাত্মিক বিষয়ক গ্রন্থ)।

'সঙ্গীত সমস্যা' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০০
রচনার সময়কাল: ১৯২৯
(মাওলানা আকরম খাঁ রচিত 'সমস্যা ও সমাধান' পুস্তকের সমালোচনা)।

'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।
(আলিপুর জেলে রচিত)।

'আমার কারাকাহিনী' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০
(কারাজীবনের কাহিনী)।

'তসফীরে সুরা ফাতিহা' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১২৫
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৪২ সাল
(মওলানা আবুল কালাম আযাদের সুরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ)।

'আহলে হাদীস আন্দোলন' (ঐ)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮০০
রচনার সময়কাল ঃ ১৩৪৬ সাল
(সাহাবীগণের যুগ থেকে অত্যাধুনিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে বাংলা ও ভারতের আহলে হাদীস আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস)।

'A Criticism on Leninism' (ইংরেজী ভাষায়)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩০
রচনার সময়কাল ঃ ১৯২৯
(লেলিন ঘোষিত কমিউনিষ্ট মতবাদের সমালোচনা)।

খ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী ঃ

আবদুল্লাহেল কাফীর সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহ প্রায় সবই তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'সত্যাগ্রহী', 'তর্জুমানুল হাদীস' এবং 'আরাফাত' পত্রিকায় প্রকাশিত।

'সত্যাগ্রহী' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী (১৯২৪-১৯২৬ সালে প্রকাশিত) ঃ

'ইসলামে জাতীয় স্বাধীনতার স্থান', 'মহাবীর গাজী আবদুল করিম', 'হিন্দু মুসলমান', ইসলামে বিশ্বজনীন একত্ববাদ, 'ভারতীয় জাতীয়তা', 'বাঙালীদের অবস্থা', বাংলার মুসলমান ও সামাজিক ব্যাধি', 'বর্তমান শিক্ষা ও ইসলামী সভ্যতা' 'রমযান', 'ইসলামে বাংলার দাবাগ্নি', 'ঈদুল আযহা', নজদের ওমারাহ্', 'বাংলার কঙ্কাল (প্রজা-জমিদার বিদ্রোহ)', 'অধিকারের নেশা: ইংরেজের শক্তিলোলুপতা', 'লক্ষ্যপথে', মোস্তফারচিত (আলোচনা)', 'বাদ্যভাণ্ড', 'স্বাধীন মুসলিম

পার্টি', 'পবিত্র স্মৃতির এক মুহূর্ত', 'মহামানবের ধর্মের আদর্শ', 'মহানবীর অগ্নিপরীক্ষা'।

'তর্জুমানুল হাদীস' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী ঃ

'সুরা আল ফাতিহার তফসীর' ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ২য় বর্ষ ১ম—১২শ সংখ্যা, ১৩৫৬।
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা—১২শ সংখ্যা,
৫ম বর্ষ ১ম—৪র্থ সংখ্যা,
১০ম— ১২শ সংখ্যা
৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম—১২শ সংখ্যা,
৭ম বর্ষ ১ম—১২শ সংখ্যা,
৮ম বর্ষ ১ম—১২শ সংখ্যা,

'হিন্দে ইসলামের আবির্ভাব', ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা—৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা।

'মোজতবা চরিতামৃত', ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা।

মুজাহিদ ইবনে হযম', ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা।

'গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি' ঐ।

'ইসলামী অর্থনীতির প্রামাণিক সূত্র', ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা।

'বিদআতে হাসানা ঐ ৫ম সংখ্যা।

[মুজাদ্দিদ আলফেসানীর ফার্সী ভাষায় লিখিত 'মকতুবাত' হতে অনূদিত]।

'ইসলামে সাম্যবাদের আকৃতি', ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা।

'যাকাতুল ফিতরা' ২য় বর্ষ, ৮ম—১০ম সংখ্যা।

'মুর্গী আগে জন্মেছে না ডিম' ২য় বর্ষ, ১৩৫৭।

'বাংলা বর্ণমালা ও উচ্চারণ' ঐ

'পাকিস্তানের শাসন সংবিধান', ঐ

'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রস্তাবাবলী' ঐ।

'ইমাম আবু ইউসুফের পুত্র হারুনুর রশীদের নামে' ঐ

'যিকরে ইকবাল' ঐ

'ঈরানী তৈলের পটভূমিকা' ঐ

'জিহাদের আহবান' ঐ

'শাসন সংবিধানের ভূমিকা' ঐ

'বর্ষশেষের আবেদন' ঐ

'মারওথন' ৩য় বর্ষ, ১৩৫৮

'সাম্যবাদের নাভিশ্বাস' ঐ

'ভাবিয়া দেখা কর্তব্য' ঐ

'বিপ্লবী ধর্ম সংস্কারক মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী' ঐ

'ইসলামের সার কথা' ঐ

[শাইখ আব্দুল হামিদ আল খতীবের আরবী রচনার অনুবাদ]

'ফির্কাবন্দীর ভয়াবহ পরিণতি' ৪র্থ বর্ষ, ১৩৫৯।

'দোজখের অবিনশ্বরত্ব'

[এটি ডঃ শহীদুল্লাহর একটি রচনার আলোচনা]

'পাকিস্তান কোন পথে' ঐ

'মুছল্লা চতুষ্টয়ের ইতিহাস' ঐ

'সঙ্গীতর্চ্চা' ৫ম বর্ষ, ১৩৬০ ও ৭ম বর্ষ।

'পাকিস্তানেব আদর্শ ও লক্ষ্য' ঐ

[ইকবালের ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ]

'ইসলাম ও মুসলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন' ঐ

'ধানের ফিতরা' ঐ

'ঈদের তকবীর সংখ্যা' ঐ

'পঞ্চম বার্ষিকী উপক্রমণিকা' ঐ

'ফাতেহাতুস ছালাতের খামেছা' ঐ [আরবীতে লিখিত]

'রসুল্লাহর নবুয়তের সার্বভৌমত্ব' ঐ

'সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণে রীতি' ঐ

'ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্স' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৬১-৬২।

'জাতীয়তার স্বরূপ ও আদর্শ' ঐ

'আহলে হাদীস পরিচিতি' ৭ম বর্ষ ১৩৬২-৬৩।

'আরবী শিক্ষা' ঐ

'স্বতন্ত্র নির্বাচন' ঐ

'আদর্শের না দলের সংগ্রাম' ঐ

'হুসান বিনে আলী ইয়াযীদ বিনে মুয়াবিয়া' ঐ

'হাদীস ও ফিকহ এর বৈপরীত্য' ঐ, ৮ম বর্ষ ১৩৬৫-৬৬ ও ৮ম বর্ষ

'অনধিকার', ৮ম বর্ষ।
'আল্লামা সৈয়্যদ আব্দুল হাদী', ঐ
'আদর্শের যুগান্তকারী মহিমা', ঐ
'আলী ভাতৃদ্বয়', ঐ ও ৯ম বর্ষ।
'জন্ম নিরোধ', ঐ [যুক্তি ও ধর্মের দৃষ্টিতে]
'শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়', ঐ
'হাদীস ও ফিকহ', ঐ
'রেনেসাঁর প্রতিক্রিয়া', ঐ
'হাদিসের প্রামাণিকতা', ঐ
'সাময়িকপত্র সমূহের আদর্শ ও তাহাদের কর্তব্য' ঐ
'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার ভবিষ্যত' ঐ
'কুরবানী বন্ধ করার ষড়যন্ত্র' ঐ
'আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা' ১৪শ বর্ষ ১৯৬৭-৬৮
[এ সময় মোহাম্মদ মওলা বখশ নাদভী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন]
'বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্যয়' ঐ
'সাহিত্যের সুর' ঐ

'আরাফাত' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী ঃ

এই পত্রিকায় তাঁর প্রচুর রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে মোহাম্মদ আবদুর রহমান পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এখানে 'আরাফাত' এ প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার নামোল্লেখ করা হলো।

'ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ককে অবশ্যই মুসলিম হইতে হইবে' ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪।

'শান্তি প্রতিষ্ঠাতারূপে রসুল্লালাহ (সাঃ)এর আবির্ভাব', ঐ ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩।

'আমার জেল ডাইরী' ঐ ৩য় বর্ষ
'কোরআনের অর্থনৈতিক পথনির্দেশ', ঐ (কোরআন সংখ্যা) ১৩৭৪।
'সাহিত্যের সুর' মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৩৯*

---

* প্রবন্ধ দুটি 'তর্জুমানুল হাদীস' পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল।

'বাংলা সাহিত্যে ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্যয়' মাসিক মোহাম্মদী ফাল্গুন ১৩৩৯।

'অদৃষ্ট' আল-ইসলাম পৌষ ১৩২৩।

উপর্যুক্ত রচনা ছাড়া সাপ্তাহিক 'সোলতান' পত্রিকায় তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সমকালীন খ্যাতনামা বাংলা সাময়িকী (হিন্দু সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত) সমূহেও তিনি নাকি ছদ্মনামে কিছু লেখা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রতিভার সম্মান

কী রাজনীতি, কী ধর্মা চর্চা, কী সংবাদপত্র সম্পাদনা—কী সাহিত্যসাধনা, মোটামুটি সবক্ষেত্রেই তিনি রেখেছিলেন সাফল্যের স্বাক্ষর। তাঁর সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জমঈয়তে আহলে হাদীসের বঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের সভাপতির পদ লাভ এবং পঞ্চাশের দশকে পূর্বপাকিস্তান সাময়িকী সম্পাদক পরিষদের সভাপতির ক্ষমতা প্রাপ্তি। বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক অবদান রাখার জন্য ১৯৬০ সালে লাভ করেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার। বাংলা একাডেমী বিধান এবং নিয়মাবলীর এর ৬-সি ও ৫-এ ধারায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সৃষ্টিধর্মী এবং গবেষণামূলক সাহিত্য-কৃতির জন্য এবৎসরই প্রথম সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এই সাহিত্য পুরস্কার প্রদান প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমী পত্রিকায় লেখা হয়েছে :

> কর্ম পরিষদ ইহার দ্বাত্রিবিংশত্তম সভায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও রসরচনা প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক রচনা প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-কৃতির জন্য পুরস্কার প্রদানের এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের প্রত্যেককে তাহাদের নামের পার্শ্বের লিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কৃতির জন্য দুই হাজার টাকা হারে পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তাঁহাদিগকে একাডেমীর সম্মানিত সদস্য [Fellow] রূপে গ্রহণ করা হয়।

১.	কবি ফররুখ আহমদ	কবিতা
২.	জনাব আবুল হাশেম খান	উপন্যাস
৩.	জনাব আবুল মনসুর আহমদ	ছোটগল্প ও রম্যরচনা
৪.	জনাব আসকার ইবনে শাইখ	নাটক
৫.	জনাব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ	প্রবন্ধ
৬.	মৌলানা আব্দুল্লাহেল কাফী	গবেষণামূলক রচনা
৭.	জনাব খান মুহম্মদ মইনুদ্দীন	শিশু সাহিত্য[১৫]

আব্দুল্লাহেল কাফী সাহিত্য সাধনায় বাংলা একাডেমীর এই স্বীকৃতি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি। তিনি মৃত্যুর ডাকে পরপারে চলে যান ৪ঠা জুন তারিখে আর বাংলা একাডেমীর উপর্যুক্ত সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হয় ১৫ই জুন তারিখে অর্থাৎ তাঁর পরলোকগমনের ১১ দিন পরে।

শেষজীবন ও মৃত্যু

আব্দুল্লাহেল কাফীর কর্মতৎপরতা মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর উপর ন্যস্ত সর্বশেষ দায়িত্বভার ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালার সর্বসম্মত উত্তরদান। এই গুরুভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চাননি, অনেকটা জোর করেই তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এমনিতেই তখন চোখের অবস্থা ভাল নয়। পিত্তশূলের দারুণ ব্যথায় টিকতে না পেরে দ্বিতীয় বারের মতো কয়েক দিন আগে অপারেশন করিয়েছেন। শরীরের এই অবস্থায়ও তিনি দায়িত্ব শেষ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন—বিশিষ্ট আলেমদের একত্রিত করে জবাব তৈরী শুরু করেন। ৪০টির মধ্যে ৩৮টি প্রশ্নের তিনি জবাব তৈরী করলেও, মাত্র ২টি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আর তৈরী করার ফুসরৎ পাননি। এই বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করার আগেই তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যান। আজীবন কৌমার্যব্রত পালনকারী এই জ্ঞান-তাপসের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়ঃ

> ৪ঠা জুন, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ ভোর ৪ঠা ২৫ মিনিটে যখন মসজিদে মসজিদে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে গেছে, জামাত খাড়া হবে

এমনি শুভ মুহূর্তে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিলেন, তাঁর দাওয়াত কবুল করে লাব্বায়েক বললেন।[১৬]

আব্দুল্লাহেল কাফীর মৃত্যুর পর বাংলা একাডেমীতে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একাডেমীর কর্মপরিষদ কর্তৃক গৃহীত শোক প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> বাংলা একাডেমী পরিষদের এই ৩৩তম সভা খ্যাতনামা আলেম, সাহিত্যিক ও গবেষক মরহুম মৌলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী সাহেবের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার ও পরিজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।[১৭]

জীবনদর্শন ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

মানুষ হিসেবে আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন খুবই সাধারণ ধরনের--অমায়িক এবং মজলিসী মেজাজের বন্ধু বৎসল। সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল এবং পরপোকারী গুণ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আক্রমণাত্মক মেজাজ নিয়ে কেউ তাঁর কাছে এলেও, পরক্ষণেই সেই ব্যক্তি কাফী সাহেবের আচরণে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাঁধা পড়ে যেত। কাউকেই তিনি আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না। জীবনে বহুবার তাঁকে হানাফী, কাদিয়ানী প্রভৃতি মযহাবের সঙ্গে বাহাছে অংশ নিতে হয়েছে ; কিন্তু এতে কখনও তিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে তাঁর স্বভাব সুলভ আচরণের সৌজন্য প্রকাশ করতে কুন্ঠিত হন নি। কখনও কারো ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হলেও উত্তেজিত হতেন না সহজে। উত্তেজিত হলেও পরক্ষণেই সহজ হয়ে যেতেন, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতেন। কোন আত্মীয় স্বজন এলে, পারতপক্ষে নিজের হাতেই তিনি তাঁদের খাওয়াতেন, দেখা শোনা করতেন।

সকলে একত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করতেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে 'আরাফাত' পত্রিকায় লেখা হয়েছে ঃ

খাদেম ও সেবকদের নিজের দস্তরখানে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়ান আর নিজের মুখের গ্রাস তাদের দান করে সন্তুষ্ট হওয়া কাফী-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৮]

আব্দুল্লাহেল কাফীর জীবনে বহু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে তাঁকে একজন সৎ ও নির্লোভ মানুষ হিসেবে দেখা গেছে। কাফী সাহেবের নির্লোভ স্বভাব সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। পাঠকদের অবগতির জন্য মুনতাসীর আহমদ রহমানীর লেখা থেকে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করছিঃ

আল্লামা তখন কলকাতা সেন্টজেভিয়ার কলেজের ছাত্র। কোন এক বন্ধে তিনি দিনাজপুরে রওয়ানা হয়েছেন, সেকেণ্ড ক্লাসের একটি সিটে তিনি বিছানা পেতেছেন, দু'জন ইংরেজ স্বামী-স্ত্রী সেই গাড়ীতে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। পার্বতীপুর জংশনে যখন গাড়ী থামল তখন তিনি তাঁর আসবাবপত্র গোটানোর সময় লক্ষ্য করলেন যে, আপার বাঙ্কে একটি লেডিজ ব্যাগ পড়ে রয়েছে কিন্তু যাত্রীরা পূর্ব স্টেশনে নেমে পড়েছেন। ব্যাগটা যে সেই ইংরেজ দম্পতির তা বুঝতে মওলানা সাহেবের বেগ পেতে হলনা। তিনি সযত্নে উহা নিজের সুটকেসে রেখে দিলেন। কলকাতা রওয়ানা হবার দু'একদিন পূর্বে তিনি সেই ব্যাগটি খুলে অবাক হয়ে গেলেন। তাতে পূর্ণ এক লক্ষ টাকার নোট ভর্তি করা রয়েছে। আল্লামা উহাকে সেভাবেই রেখে দিলেন আর নির্দিষ্ট তারিখে কলকাতা গিয়ে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় হারানো প্রাপ্তির কলামে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন। ইংরেজ দম্পতি সপ্তাহ খানেক অপেক্ষার পর নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ 'স্টেটসম্যানে' বিজ্ঞাপন দেখে তাঁরা আশার আলোক দেখতে পেলেন। ব্যগ্রব্যাকুল চিত্তে তাঁরা ছুটে আসলেন বিজ্ঞাপন দাতার সন্ধানে তাঁর কলেজ হোস্টেলে। তাঁর কাছে হাযির হলে তিনি সেই ব্যাগটি সেই অবস্থায়ই তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তাঁরা আনন্দে আটখানা হয়ে উঠলেন। মেম সাহেবা আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে আল্লামাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগলেন আর অপর ব্যাগ থেকে ১০/১২ হাজার টাকার একটা মোটা পুরস্কার গ্রহণ করতে তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সেটা প্রত্যাখান

করলেন। অবশেষে তাঁদের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি তাদের কাছ থেকে কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক গ্রহণ করেন।[১১]

আব্দুল্লাহেল কাফী দার পরিগ্রহণ করেন নি। একারণে, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান-সন্ততির সাহচর্য লাভের সুযোগ তাঁর হয়নি। কিন্তু তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়—তিনি ছিলেন শিশুদের খুবই আপন-জন; অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাদের। কোন অভিভাবক তার সন্তানকে মারধোর করলে তিনি মনে মনে খুব রুষ্ট হতেন। তিনি ছিলেন খুবই গোছালো স্বভাবের মানুষ। প্রাণান্তকর অসুখ পিত্তশূলের ব্যথা নিয়েও তিনি নিজে কাপড়-চোপড়, বইপত্র গুছিয়ে রাখতেন—পারতপক্ষে এসব কাজে কারও সাহায্য নিতেন না।

বাগ্মী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল সর্বত্র। বাংলা এবং উর্দু ভাষায় ছিল তাঁর পূর্ণ দখল। কী ধর্মীয় কী রাজনৈতিক সববিষয়েই তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। বোধকরি এই গুণটির জন্যই তিনি মওলানা আবুল কালাম আযাদ, শহীদ সুহরাওয়ারদী, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখ দেশ হিতৈষী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের এবং তাঁদের সাহচর্যে যাবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য থাকতো যুক্তিনির্ভর এবং তথ্য সমৃদ্ধ। একারণে কী রাজনৈতিক, কী ধর্মীয় সভা সর্বত্রই দেখা যেত জনসমুদ্র।

আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের একটি বড় গুণ ছিল, তিনি তাৎক্ষণিক-ভাবে কোন বিষয়বস্তুর ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারতেন। শোনা যায়, একবার ময়মনসিংহের জামালপুরে একটি ইসলামী জালসায় তাঁকে প্রধান বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁর ধারণা, যেহেতু ইসলামী জালসা সেকারণে ধর্ম বিষয়ের ওপরই তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর বক্তৃতা দেবার পালা, তখন ঘোষক আকস্মিক-ভাবে ঘোষণা দিলেন, প্রধান বক্তা কাফী সাহেব ইসলাম ও কমিউনিজম এই সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন। ঐ ঘোষণায় প্রথমে একটু রুষ্ট হলেও পরে যথারীতি স্বভাব সুলভ ঢংয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘোষিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা করে সবাইকে বিমোহিত করেন। কাফী সাহেবের এই বক্তৃতাটিই পরে 'ইসলাম ও কমিউনিজম' এই শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

আবদুল্লাহেল কাফীর আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল। ব্যক্তিগত পর্যায়েই হোক আর সমষ্টিগত পর্যায়েই হোক কেউ কোন অন্যায় অপবাদ দিলে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না—প্রতিবাদ করতেন। ১৯৪০ সালে একবার দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনভেনশন। মহাধুমধামের সঙ্গে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাতে প্রায় ১৪০০ প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেছিল।[২০] ঐ কনভেনশনে উপমহাদেশের সুবিখ্যাত আলেম মওলানা মোহাম্মদ জুনাগড়ী বক্তৃতা দিতে গিয়ে দিল্লীতে অধ্যয়নরত বাঙালী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তারা যেন অধ্যয়ন শেষে দিল্লী থেকে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে পীরবাদ কায়েম না করে। কনভেনশনে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি আবদুল্লাহেল কাফীর বাঙালীত্বে আঘাত লাগে, তিনি বক্তৃতা করতে গিয়ে মওলানা জুনাগড়ীর বক্তব্যের জোর প্রতিবাদ করে বাঙালী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

> হে আমার স্নেহের বাঙালী ছাত্র বন্ধুরা, তোমরা মাতৃভূমি বাংলা থেকে সুদূর দিল্লীতে এসেছ শুকনো রুটি খেয়ে ধর্মীয় বিদ্যা কোর-আন ও হাদীস শেখবার উদ্দেশ্যে। তোমরা যেন কোরআন হাদীসের এলমই শেখো, সাবধান পীর মুরীদির সবক শিখোনা, খবরদার, তোমরা এখান থেকে পীর মুরীদির দুষিত জীবাণু বয়ে নিয়ে বাংলার মুক্ত বায়ুকে কলুষিত করো না ...। বাংলাদেশের কোথাও পীর মুরীদি শেখানো হয় না এবং তথায় ইহার আখড়াও নেই।... এ দেশ থেকে যারা লেখা পড়া শিখে যায়, তারাই দেশে গিয়ে পীর মুরীদির জাল বিস্তার করার অপচেষ্টা করে থাকে। তাই তোমাদেরকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি, সাবধান তোমরা এ জীবাণু নিয়ে যেয়োনা দেশে।[২১]

কাফী সাহেব সাদামাটা ধরনের মানুষ ছিলেন বলে বৈষয়িক বিষয়ে দূরদর্শিতার অনেক ক্ষেত্রে অভাব ছিল। নিজের ভালোমন্দের বিষয়ে বাছবিচার একদমই ছিল না। অনেকটা বেহিসেবী স্বভাবও তার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। তবে তাঁর সেই বেহিসেবীপনা কোন বাহুল্য কাজে ব্যয়িত হয় নি, সমষ্টিগত কল্যাণের স্বার্থেই তা ব্যয়িত হয়েছে। আবদুল্লা-হেল কাফীর বেহিসেবী খরচের বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন,

তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার পরবর্তীকালের অন্যতম সহকর্মী ও সুহৃদ খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। মঈনুদ্দীন সাহেব 'সত্যাগ্রহীর' আর্থিক সংকট বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> বেশ কিছু টাকা হাতে নিয়ে তিনি পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। নিজে তিনি খুব হিসেবী লোক ছিলেন না। তার উপর তিনি থাকতেন সব সময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। উপযুক্ত তখন তাঁর কাছে এমন কেউ ছিল না যে এই সংসার অনভিজ্ঞ মওলানাকে বাস্তব পরামর্শ দিতে পারে। দেড়শ টাকা বাড়ী ভাড়া তার ওপর প্রেসের দ্বিগুণ বিল মেটাতে গিয়ে তিনি দিন দিন কাহিল হয়ে পড়েছিলেন।[২৫]

আবদুল্লাহেল কাফী দীর্ঘকাল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তাহলো সততা। রাজনীতির খাতিরে কখনও নোংরামীকে প্রাধান্য দেন নি। মিথ্যা বলে সত্যকে চাপা দেননি। সত্য তাঁর জীবনের আদর্শ, সারাজীবন ধরে তিনি সেই সত্যের সাধনাই যে করে গেছেন।

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক, ধর্মীয় মতাদর্শের দরুন এবং সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সমকালে আব্দুল্লাহেল কাফী যেমন প্রশংসিত হয়েছিলেন, তেমনি নানা কারণে নিন্দিতও হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের আহলে হাদীস মযহাব নিয়ে সেকালে হানাফী মযহাবে বিরূপ আলোচনার সৃষ্টি হয়। হানাফী মযহাবের পত্রিকা 'শরিয়ত'এর ২য় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সংখ্যায় লেখা হয় ঃ

> মোহাম্মদী মৌলবীগণ ধর্ম্মসভার নাম করিয়া কেবল মযহাবের কুৎসা রটনা করিয়া হানাফি মযহাবলম্বিগণকে মোশরেক বেদয়াতি ও দোজখী বলিয়া সমগ্র হানাফি সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।...মৌলবী আব্দুল্লাহেল কাফী ও মৌলবী আব্দুল্লাহেল বাকী, এই ভ্রাতাযুগল রংপুর অঞ্চলে ফৎওয়া জারি করিয়াছেন যে, যদি কোন মোহাম্মদী হানাফি শ্বশুরালয়ে নাস্তা করিবে তবে

।/. আনাও আহার করিলে ॥৵ আনা জরিমানা দিবে।* আমরা কয়েকস্থান হইতে তাঁহাদের বিদ্বেষ বহ্নি ছড়াইবার সংবাদ পাইতেছি।

গবেষক শফিউল আলম 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫, পৃষ্ঠা ৬৬ তে, 'সাপ্তাহিক মোসলেম জগৎ' পত্রিকা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেন ঃ

> ১৩২৯ সালের ১৬ই ফাল্গুন সংখ্যার 'মোসলেম জগৎ'এ প্রাপ্তপত্র অংশে 'জমানার' ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক মৌলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ও রংপুর জেলা খেলাফৎ কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে লিখিত একটি কৌতূহল জনক প্রতিবাদ পত্র দেখা যায়।

কৌতূহলজনক প্রতিবাদটি কি, শফিউল আলম সাহেব তাঁর প্রবন্ধে বিস্তারিত কিছু বলেন নি। তবে আমাদের অনুমান মযহাবগত ফারাকের কারণেই সম্ভবতঃ কোন কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছিল।

কেবল ধর্মীয় মযহাবগত পার্থক্যই নয়, তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়েও নানা সময়ে বিতর্ক উঠেছিল। ১৩৩৯ এর ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ১৩৪০ এর আষাঢ় সংখ্যা অবধি, 'বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচি-বিপর্যয়,' নামে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তা সমকালীন সাহিত্যিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ঐ প্রবন্ধে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' সাহিত্য শাখার সভাপতি কাজী আব্দুল ওদুদকে বিরূপভাবে সমালোচিত করায় কাজী সাহেবের অনুসারী কবি সাহিত্যিকগণ আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেবের রচনাটির বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁরা তাঁর প্রকাশিত 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকা সম্পর্কেও অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কেউ বলেছেন পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গী গোঁড়া, কেউ বলেছেন ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল আর কেউবা বলেছেন অনেক আধুনিক ও পাশ্চাত্য জীবনধারার চরম বিরোধী।[২৩] পক্ষান্তরে তৎ-

---

* লেখক হয়ত জানতেন না অথবা জানলেও বেমালুম ভুলে যেতে চেষ্টা করেছেন যে, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও তদীয় পিতা মওলানা আবদুল হাদী উভয়ই হানাফী পরিবারে বিবাহ করেছিলেন।

কালের অনেক নামী-দামী কবি-সাহিত্যকরা আবার এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। আব্দুল্লাহেল কাফীর সাংবাদিক জীবন আলোচনা কালে সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

কেবল বিশেষ কোন পত্রিকার কথাই নয়, তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্ম পর্যালোচনা করলে, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা দুই-ই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু আব্দুল্লাহেল কাফী কেন, যে কোন বড় ধরনের প্রতিভার মূল্যায়নে এর ব্যত্যয় খুঁজে পাওয়া দায়।

তথ্যনির্দেশ

১. 'সাপ্তাহিক আরাফাত' ২রা জুলাই ১৯৬২ (আব্দুল্লাহেল কাফী বিশেষ সংখ্যা), ৮৬ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা, পৃঃ ৩০।
২. আব্দুল্লাহেল কাফী. 'তর্জুমানুল হাদীস', ৮ম বর্ষ, ১৯৫৮-৫৯, পৃঃ ৩১৫।
৩. 'সাপ্তাহিক আরাফাত' প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
৫. মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, 'আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহ) সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য', ৯৮ নওয়াবপুর, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৪।
৭. 'সাপ্তাহিক আরাফাত' প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।
৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
১২. আব্দুল্লাহেল কাফী, 'তর্জুমানুল হাদীস', ৮ম বর্ষ, ১৯৫৮-৫৯, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬।
১৩. আব্দুল কাদির, 'মাহেনও', ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৭, পৃঃ ৫৪।
১৪. আব্দুল্লাহেল কাফী, 'তর্জুমানুল হাদীস,' ৮ম বর্ষ, পৃঃ ১৭৪-১৭৫।
১৫. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃঃ ৬৪।
১৬. 'সাপ্তাহিক আরাফাত' প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।
১৭. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃঃ ৬৭।
১৮. 'সাপ্তাহিক আরাফাত' প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
২০. মৌলানা আবুল কালাম আযাদ, 'ভারত স্বাধীন হল' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৯।

২১. 'আরাফাত', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

২২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

২৩. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, 'সামরিকপত্রে জীবন ও জনমত', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃঃ ৪৪২।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বর্তমানে প্রকল্প উপদেষ্টা, অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প, ঢাকা।

২. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রাক্তন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, কাদিরগঞ্জ রাজশাহী।

৩. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, সম্পাদক 'আরাফাত', ঢাকা।

৪. মুহম্মদ নিজামউদ্দীন, রাণীবাজার রাজশাহী।

৫. ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজশাহী।

৬. অধ্যাপক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. অধ্যাপক মজিবুর রহমান, —ঐ—।